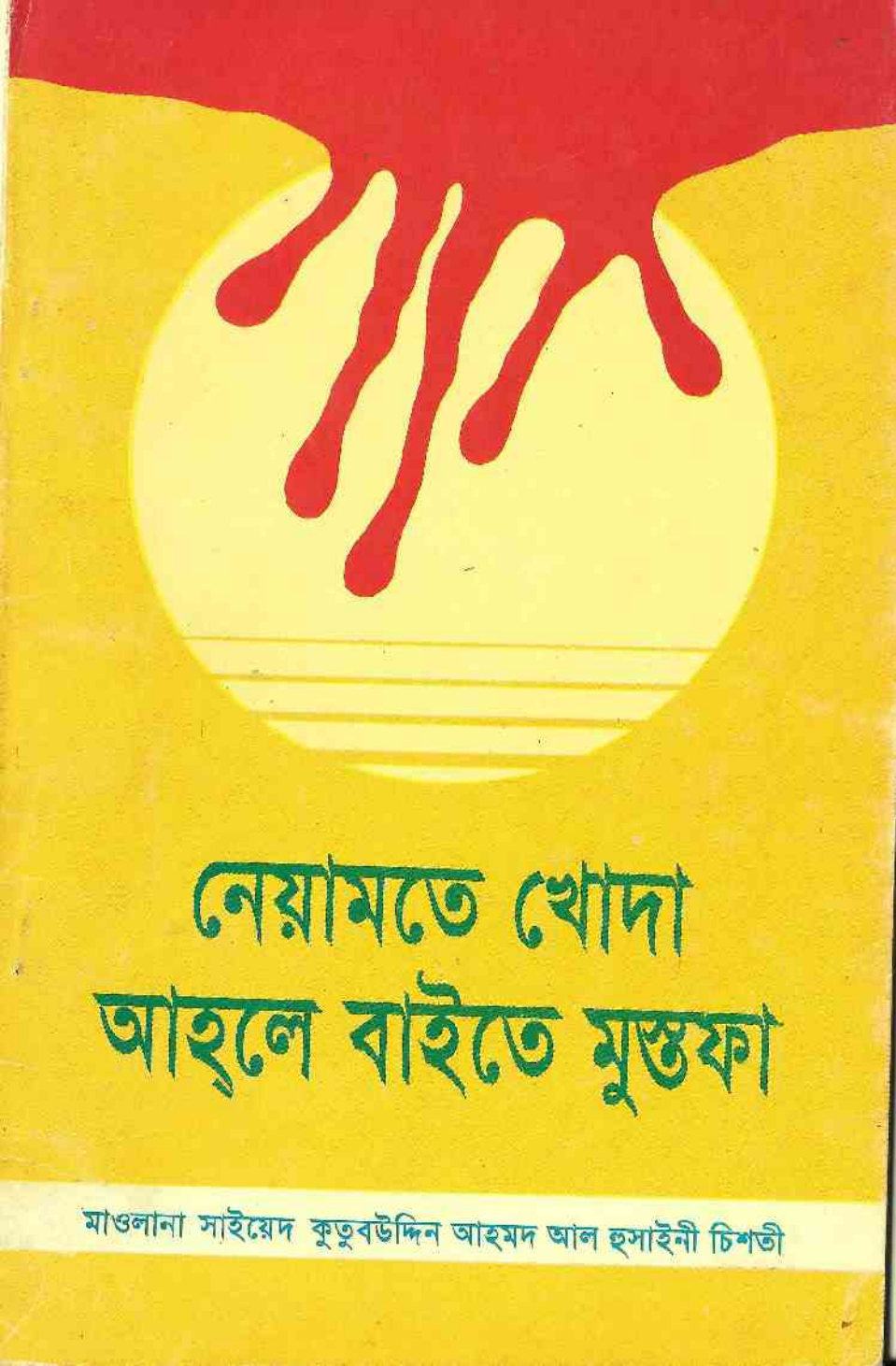

নেয়ামতে খোদা আহ্‌লে বাইতে মুস্তফা

মাওলানা সাইয়েদ কুতুবউদ্দিন আহমদ আল হুসাইনী চিশতী

নেয়ামতে খোদা আহলে বাইতে মুস্তফা

মাওলানা সাইয়েদ কুতুবউদ্দিন আহমদ আল হুসাইনী চিশতী
অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ

প্রকাশক
মেজর (অবঃ) মোঃ আবদুল ওয়াহেদ
আল হোসেইনী প্রকাশনী
পাক পাঞ্জতন পরিষদ
বাড়ী নং-১১, সড়ক নং-১০
সেক্টর-৬, উত্তরা, ঢাকা।

প্রকাশকাল ঃ
১০ মুহররম, ১৪১৭ হিজরী
২৯ মে, ১৯৯৬ ইংরেজী
১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৩ বাংলা

প্রচ্ছদ ঃ
আরিফুর রহমান

মুদ্রণ ঃ
চৌকস, ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৪১৯৬৫৪

টাকা-১৫

হাদিয়া ঃ
২০ (কুড়ি) টাকা

NIAMAT-E-KHODA AHLE BAIT-E-MUSTAFA
Written by Maolana Syed Kutubuddin Ahmad Al Hussaini Chishti, Published by Major (Ret.) M. Abdul Wahed, Sponsored by Al Hossaini Prokashoni of Pak Panjton Association, House No. 11, Road No. 10, Sector 6, Ph : 895717 Uttara, Dhaka.

ভূমিকা

পাক পাঞ্জতনের ভূমিকায় মহানবীর (সাঃ) পবিত্র আহ্‌লে বাইত সম্পর্কে যা বলেছেন বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থে ও ইতিহাসে তা নিয়ে যথেষ্ট লেখালেখি হয়েছে এবং হচ্ছে। অতীতের লোকেরা একভাবে তা তুলে ধরেছেন বর্তমান যুগের নব্যপন্থী লেখকগণ তা গ্রহণ করেছেন ভিন্ন দৃষ্টিতে। ইতিমধ্যে মাওলানা সাইয়েদ কুতুবউদ্দিন সাহেবের যে আত্মোপলব্ধি হয়েছে তা হচ্ছে "নিয়ামতে খোদা আহ্‌লে বাইতে মুস্তফা"। পরম করুণাময় মহান আল্লাহর অশেষ কৃপায় তিনি পবিত্র কোরান-হাদিস ও আলেম-উলামার বাণীর আলোকে "আহলে বাইতের" উচ্চ মর্যাদা ও ফযীলত; হযরত আলী, মা ফাতিমা, হাসান ও হোসাইন (রাঃ)-এর সম্যক মর্যাদা সবার সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। একদিকে তাঁদের মাহাত্ম্য অন্যদিকে তাঁদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দৃষ্টিভঙ্গি লীন হয়ে গেছে তাঁদেরই আধ্যাত্মিক জ্যোতির মধ্যে। এ থেকে তাঁদের সঠিক মূল্যবোধ আরো অনেক উর্ধ্বে। আর তা হচ্ছে যার জন্যে তাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছেন। এ বিষয়ে আমরা ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথ অবলম্বন করে অনেক কিছুই বলে থাকি। ফলে তা বাহুল্যের মধ্যে রূপকথা বলে গণ্য হয়। কিন্তু যে সত্যিকার উদ্দেশ্যে তাঁরা আত্মবিসর্জন দিয়েছেন সে সম্বন্ধে খুব কমই আমরা আলোচনা করে থাকি।

শিয়া, সুন্নী, রাফিজী মতের বিভিন্ন মাজহাবী সমাবেশে পবিত্র আহলে বাইতের আত্মোৎসর্গের যে মহান আদর্শ ইসলামের ইতিহাস সন্নিবেশিত করেছে তাঁদের সে আত্মাহুতির মহত্ত্ব সম্পর্কে আমরা কিছু বলার অভিলাষ রাখি। সূচনাতেই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি যে, এটা একটা সুকঠিন কাজ। আমাদের জ্ঞানের পরিধি ও বুদ্ধিগত যোগ্যতা এ ধরনের দুরূহ-ঝুঁকিপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয়ার ব্যাপারে অনুমতি দেয় না। এ বিষয়ে বিরাজমান বিদ্বেষপূর্ণ মতপার্থক্য আমাদের অধিকতর সঙ্গীন করে তুলে। একদিকে জ্ঞান-ভিত্তিক, বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি-তর্কে ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মনগড়া বিতর্ক যা আলোচনা অসম্ভব। তবুও প্রেমের আকর্ষণে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে কোরান-হাদিস ও মহান মুসলিম মনীষীদের সহায়তায় আলোচনার প্রয়াস পাব। অপর পক্ষে পাক পাঞ্জতনের ইতিহাস, আহলে বাইতের মাহাত্ম্যপূর্ণ আদর্শের চ্যালেঞ্জ ঘোষণা এত বেশী উদ্দীপনাময় যা অগ্নিকুণ্ডে স্পিরিট ঢেলে দেয়ার শামিল। যুক্তি এখানে ভোঁতা হয়ে যায়, ভাষা খেই হারিয়ে ফেলে, এমন কি চিন্তাশক্তিও হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত। কারণ পরিশুদ্ধ ভালবাসা এবং গভীর প্রজ্ঞার সমন্বয় হতে এর সৃষ্টি। একই সংগে উভয়ের উপস্থাপনার ব্যাপারে খুব কম লোকই তা সক্ষম। তাই বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর সঠিক মূল্য উপলব্ধি করতে পারে না। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাবলীর শোকানুভূতিতেই আশুরার (১০ মহররম) মহররম পর্ব উদ্‌যাপিত হয়। হোক না তা

বহুমুখী ঘটনাবহুল শুভ-অশুভ কর্মকাণ্ডের জন্মদিন। সে সব উপেক্ষা করে যে সকল আত্মউৎসর্গকারী অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছেন। সমগ্র মুসলিম উম্মাহর উচিত তাঁর ঐ মূল্যবান অবদানকে সবসময়ই অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করা। আমরা যদি সত্যিকার মুসলমান হয়ে থাকি তাহলে সেই চরম বিপর্যয়ের দিনে অসহায় হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর সেই মর্মান্তিক শোকাবহ স্মৃতি বুকে নিয়ে ক্রন্দন করা উচিত। কারণ এতে নাজাতের অঙ্গীকার রয়েছে-সবার জন্য, সকল মানবগোষ্ঠীর জন্য। যারা হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) জন্য আশুরার দিন বিলাপ করে, মহান আদর্শের প্রতি মাথা নত করে, যারা হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-র মত বিশ্বাস করে যে জীবন কিছুই নয়, বরং "বিশ্বাস ও জিহাদ" ছাড়া। যারা আহলে বায়াতের প্রতি আত্মনিবেদিত এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-র বিশ্বস্ত অনুসারী অবশ্যই তারা সকল যুগের মুসলমানদের মধ্যে কারবালার ঐ মর্মান্তিক কাহিনীর অবতারণা করবে, শোকানুষ্ঠান করবে।

যারা আমাদের পরবর্তী সময়ে আসবে, তাদের জন্য স্মারক বাণী হচ্ছে "নিয়ামতে খোদা আহ্‌লে বাইতে মুস্তফা"র লিপিবদ্ধ বাণী। আর তা হচ্ছে কি করে সত্যিকারভাবে বাঁচা যায় এবং কিরূপে উত্তম মৃত্যুবরণকারী হওয়া যায়। সে লক্ষ্য অর্জনে মানুষের দায়িত্ব রয়েছে মানবতার মুক্তির জন্য হক ও বাতিলের সংঘর্ষে সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়া। কারণ মুসলমানদের নিকট হযরত ইমাম হোসাইনের (রাঃ) শাহাদাত ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও মহান আদর্শের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। তাঁর ঐ শাহাদাতের উপর আমাদের সুপরিচিত ধর্মনিষ্ঠ সাইয়েদ কুতুব উদ্দিন সাহেব সুনিপুণভাবে মহান ইমাম তথা "আহ্‌লে বাইত"-এর আদর্শ তুলে ধরেছেন। তাঁর এ মূল্যবান অবদান সব সময়ই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরিত হবে।

আমাদের মহান শহীদ সরদারগণ আমাদের চিরমুক্তি ও নাজাতের সাক্ষ্য বহন করেছেন। তাঁরা জীবন্ত ও চিরঞ্জীব। তাঁরা হচ্ছেন আদর্শের নমুনা। হক ও বাতিলের সাক্ষ্য, মানবতার লক্ষ্য এবং সৌভাগ্যের নিদর্শন। এ ক্ষুদ্র পুস্তিকার মাধ্যমে তা উপলব্ধি করা যাবে। পরিশেষে মহাজ্ঞানী-গুণী, অলী-আওলিয়া, সুফী-দরবেশদের বহু মূল্যবান গ্রন্থের উর্দু, ফারসী, আরবী ও বাংলা বয়ানের তর্জমায়, কোরান-হাদিসের অহী বাণীর আলোকে সংকলিত সাইয়েদ কুতুব উদ্দিন সাহেবের এ মূল্যবান পুস্তিকাখানি পাঠে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল ভাইবোন ইসলামী চিন্তাধারায় পাক পাঞ্জতনের অচল অটল প্রত্যয়, আহলে বাইতের অনুপম প্রেম, বিশেষ করে ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর শাহাদত বরণে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান পাবেন বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে পাক পাঞ্জতন ও আহ্‌লে বাইতের-ব্রত গ্রহণ করার এবং সে মতে আমল করার তৌফিক দিন। আমীন।

ডাঃ এস, এ, নেওয়াজ
মৌলভীপাড়া, কিশোরগঞ্জ
অষ্টগ্রাম-২৩৮০

AwliyaLink, www.ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com,
E-mail: awliya1214@gmail.com
★★★★★★★★★★★★★★

লেখকের আবেদন

এ যুগের একদল লোক আহ্‌লে বাইতের প্রতি ভালবাসার পরিচয় প্রদান করা ও তাঁদের স্মরণে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনের বিরোধী। যদিও তাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি (আহ্‌লে বাইতের) ভালবাসা স্বীকার করেন কিন্তু তাদের সীমাহীন দুঃখের কথা স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জন করা ও তাঁদের স্মরণে শোকানুষ্ঠান পালনকে বিদ্‌আত ও হারাম বলে প্রচার করে থাকেন।

আর একদল, আহ্‌লে বাইতের পাগল। তারা আহ্‌লে বাইতের ভালোবাসাকে মহানবী (দঃ) এর ভালোবাসা মনে করেন এবং তাঁহাদের ভক্তি-ভালোবাসাই ঈমানের চাবিকাঠি বা মুক্তির সনদ বলে বিশ্বাস রাখেন। সুতরাং তারা জনমনে আহলে বাইতের ভক্তি-ভালোবাসার বিকাশ ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাঁদের প্রশস্তিমুলক কাব্য-কবিতা, শোকগাঁথা, গজল কাছিদা, জারিগান, মাহফিল-মজলিস, মিছিল, ফাতেহাখানি ইত্যাদি পালন করে থাকেন। এজন্য দুই দলের মধ্যে বিবাদ-বিদ্বেষ চলে আসছে। এতে ধর্মের আসল উপকরণ ভ্রাতৃত্ববোধ-সহানুভূতিশীলতা ব্যাহত হচ্ছে। তাদের পরস্পরের হিংসাত্মক মনোভাব দূর করার ও আসল ব্যাপার উপলব্ধি করার নিমিত্তই এ পুস্তকখানা রচনার কারণ। এ পুস্তক দ্বারা যদি কেউ কিঞ্চিত উপকৃত হন আমি বান্দার জন্য দোয়া করবেন এই কামনাই রইল।

পবিত্র কোরান, হাদিস এবং মহান মুসলিম মনীষীদের বাণীর আলোকে আহ্‌লে বাইত অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ), মা ফাতেমা (রাঃ)-ইমাম হাসান (রাঃ) এবং ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর উচ্চমর্যাদা ও ফযীলত তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

AwliyaLink, www.ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com,
E-mail: awliya1214@gmail.com
★★★★★★★★★★★★★★★

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরানে বলেছেন, "হে নবী আপনি আপনার উম্মতকে বলে দিন, আমি আমার নিকট আত্মীয়দের ভালোবাসা ছাড়া (রিসালাতের দায়িত্ব পালন করার জন্য) তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না।"–(আল কোরান ঃ সূরা শুরা ২৩)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আরজ করেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! হে মহান আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনার নিকটাত্মীয়দের ভালোবাসা আমাদের উপর ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। আপনার নিকটাত্মীয়গণ কারা?

মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (রাঃ) আমার নিকটাত্মীয়। (তাফসীরে হোসাইনী, তাফসীরে কবীর, তাফসীরে আল কাশ্‌শাফ)

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস–(রাঃ) থেকে বর্ণিত যখন'ফাকুল তাসআলু নাদয়ু আবনা আনা ও আবনা আকুম' আয়াত শরীফ নাজিল হলো তখন মহানবী (সাঃ) আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইনকে (রাঃ) ডেকে বললেন, হে খোদা এরাই আমার আহলে বাইত (দ্রঃ মেশকাত শরীফ)। খৃষ্টানরা যখন ইসলামের প্রতি বিদ্রুপ প্রদর্শন করে তাদের ধর্মমতকে উত্তম বলে প্রচার করতে লাগল নবী করীম (সাঃ) এর জন্য দলীল হিসেবে আল্লাহর আয়াতে 'মোবাহিলা' * নাজেল হয়। আল্লাহ বলেন ঃ "ফাকুল তাসআলু নাদয়ু – – – ওয়া আনফুছানা ওয়া আন ফুছাকু ছুম্মাম নাবতাহেল ফা–নাজয়াল লায়ানাতাল্লাহি আলাল কাজেবীন।" অর্থাৎ "আল্লাহ বলেন (হে রাসূল) আপনি বলে দিন, এসো আমরা (উভয়েই) ডেকে নেই আমাদের পুরুষ পুত্র সন্তানদেরকে, তোমাদের পুত্র–সন্তানগণকে আমাদের স্ত্রীলোককে তোমাদের স্ত্রীলোককে, আমাদের নফছগণকে ও তোমাদের নফছগণকে তারপর মোবাহিলা করি, যারা মিথ্যার উপর দণ্ডায়মান তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক", (কোরান–৩ পারা ১৩ রুকু)

এসময় খোদার রাসূল (সাঃ) ইমাম হোসাইন (রাঃ) কে কোলে নিলেন আর ইমাম হাসান (রাঃ)এর হাত ধরে ময়দানের দিকে অগ্রসর হলেন। পেছনে মাওলা আলী

---

*টীকা ঃ "মোবাহিলা" অর্থ হলো দু'টি পক্ষের মধ্যে উভয়ই নিজেদেরকে সত্যবাদী বলে এবং একে অন্যকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করলে নিজ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়–স্বজনসহ উভয় পক্ষই ময়দানে উপস্থিত হয়ে সৃষ্টিকর্তার নিকট এই বলে প্রার্থনা করা যে "হে প্রভু! যা সত্য তা প্রতিষ্ঠিত কর এবং যা মিথ্যা তা তুমি ধ্বংস করে দাও"।

ও রমণীকুল শিরোমণি মা-ফাতেমা চললেন। উক্ত পবিত্র পাঁচজন তাওহীদের সাক্ষ্য দিতে যাচ্ছেন। ময়দানে পৌঁছেই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন "হে আমার আহলে বাইত! আমি যখন প্রার্থনা করব-তোমরা তখন আমিন-আমিন বলবে"। খৃষ্টান দলপতি পবিত্র পাঁচজনের চেহারা মোবারক দেখে বলতে শুরু করলো, "হে খ্রীষ্টান ভাইগণ! আমি এ পাঁচজনের মাঝে ঐশী জ্যোতির রূপ দেখছি। তাঁরা যদি এ পাহাড়কে সরে যেতে বলে তাহলে পাহাড়ও স্ব-স্থান থেকে সরে যাবে। তাঁরা যদি হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করে তাহলে আর উপায় নেই। আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব।"

তারা তখন মহানবীর (সাঃ)-এর সঙ্গে সন্ধি করে নিল। মহানবী (সাঃ) সহ ঐ পাঁচজনই হলেন "পাক পাঞ্জতন"।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ মহানবী (সাঃ) একদিন বাইরে বের হলেন। উটের কাজওয়ার নক্সা বিশিষ্ট একটি কালো চাদর তাঁর দেহে ছিল। এমন সময় হাসান ইবনে আলী (রাঃ) উপস্থিত হলেন। মহানবী (সাঃ) তাঁকে চাদরের ভিতর ঢেকে নিলেন, তারপর হোসাইন আসলে তাঁকেও চাদর দ্বারা ঢেকে নিলেন। তারপর মা ফাতেমা ও ক্রমান্বয়ে আলী আসার পর তাদেরকে চাদরের ভিতর প্রবেশ করিয়ে সূরা আহযাবের "ইন্নামা ইউরিদুল্লাহ" হতে আয়াতের শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করলেন। অর্থাৎ "হে নবী! আল্লাহ পাক চান, আপনার আহ্লে বাইতকে সকল অপবিত্রতা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।" (সূরা আহযাব ঃ ৩৩)

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন মহানবী (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আলী (রাঃ) ফাতেমা (রাঃ), হাসান (রাঃ) এবং হোসাইন (রাঃ)-এর সংগে যুদ্ধ করে, আমি তার সংগে যুদ্ধ করি। যে তাদের সংগে সন্ধি করে আমি তার সংগে সন্ধি করি।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলে খোদা মহানবী (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আলী (রাঃ), ফাতেমা (রাঃ), হাসান (রাঃ) এবং হোসাইন (রাঃ) কে ভালবাসে সে আমাকে ভালোবাসে। যে ব্যক্তি তাঁদের সংগে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে সে আমার সংগেও বিদ্বেষ ভাব রাখে। (মাজাহারে হক)

হযরত মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "হে আল্লাহ! আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা। হে খোদা! যে আলীকে ভালোবাসে তুমি তাকে ভালোবাস। যে আলীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তুমি তার প্রতি শত্রুতা পোষণ কর।" অপর এক রাওয়ায়েতে আছে, "যে আলীকে ভালোবাসে তুমি তাকে ভালোবাস। যে আলীর প্রতি বিদ্বেষ ভাব রাখে তুমি তার প্রতি বিদ্বেষ রাখ। যে আলীকে সাহায্য করে তুমি তাকে সাহায্য কর। যে আলীকে সাহায্য করে না তুমি তাকে সাহায্য করো না এবং যেদিকে আলী যাবে সেদিকে হক বা সত্যকে প্রবাহিত কর।" (মেশকাত, মনছাবে ইমামত),

(মাজাহারে হক ১২৫/১২৬পৃঃ)

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হযরত নবী করিম (সাঃ) ফরমায়েছেনঃ যে আমাকে ও হাসান-হোসাইনকে এবং তাদের মা-বাপকে ভালবাসে কিয়ামতের দিন সে আমার সংগে থাকবে (মোজাহারে হক মাদারেজুন্নাবুয়্যাত)

মেশকাত শরীফের একটি হাদিসে বর্ণিত আছে, হযরত মহানবী (সাঃ) দোয়া করেন, "হে খোদা! হাসান ও হোসাইন (রাঃ)কে যে ভালোবাসে তুমি তাকে ভালবাস।" মহানবীর দোয়া কখনো বৃথা যেতে পারে না। ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনকে যে ভালোবাসবে মহান আল্লাহ অবশ্যই তাকে ভালোবাসবেন। আর যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসবে না, ভালোবাসার পরিচয় প্রদর্শন করবে না আল্লাহ তাকে কখনো ভালোবাসবেন না-সে যত বড় ইবাদতকারী বা আলেমই হউক না কেন।

হযরত সৈয়দ শাহ আব্দুল হাকিম আল্-হুছাইনী (রাঃ) বলেন, যার অন্তরে পাক পাঞ্জতনের শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি নেই এবং তাঁদের প্রতি ভালোবাসা নেই সে আজাজিল শয়তান (ইবলিস) অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। লক্ষ লক্ষ সেজদার বদলেও সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত-হাসান (রাঃ) তাঁর মাথা হতে বক্ষস্থল পর্যন্ত এবং হোসাইন (রাঃ) তার বক্ষস্থল হতে নিম্নদেশ পর্যন্ত নবীজী (দঃ)-এর দেহাকৃতি পেয়েছিলেন।

অর্থাৎ তারা দু'ভাইয়ের মধ্যে নবীজীর সম্পূর্ণ দেহাকৃতির সাদৃশ্য দৃশ্যমান ছিল। (মেশকাত, তিরমিজি)

ইবনে আসাকিরের বর্ণনায় রয়েছে-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ হাসান ও হোসাইনের প্রতি যে ব্যক্তি শত্রুতা রাখে সে আমার প্রতি শত্রুতা রাখে। যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসে সে আমাকে ভালোবাসে। সুতরাং ইমাম হাসান ও হোসাইনের (রাঃ) প্রতি ভালবাসা-প্রকৃতপক্ষে মহানবীর (দঃ) প্রতি ভালোবাসা বুঝায়। ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনের (রাঃ) প্রতি শত্রুতা প্রকৃতপক্ষে মহানবীর (সাঃ) প্রতিই শত্রুতা বুঝায়।

(তাফরিরুস শাহাদাতাইন)

হযরত ইয়ালা ইবনে সুরা (রাঃ) বর্ণিত নবী করিম (দঃ) বলেছেন হোসাইন আমা হতে এবং আমি হোসাইন হতে। অর্থাৎ আমি আর হোসাইন একই দেহতুল্য। আমার প্রতি ভালোবাসা যেমন ওয়াজিব হোসাইনের প্রতি ভালোবাসাও তেমনি ওয়াজিব। আমার সংগে বাদানুবাদ এবং লড়াই করা যেমন হারাম হোসাইনের সংগে বাদানুবাদ এবং লড়াই করাও তদ্রুপ হারাম। হোসাইনকে যে ব্যক্তি ভালোবাসে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। অর্থাৎ হোসাইনের ভালোবাসাই মহানবীর ভালোবাসাএবং মহানবীর ভালোবাসাই মহান আল্লাহর ভালোবাসা। (মেশকাত, মাজাহেরে হক)

মহান আল্লাহকে ভালোবাসতে হলে মহানবীকে ভালোবাসতে হবে। মহানবীকে

ভালো না বাসলে আল্লাহর ভালোবাসা হবে না। তদ্রুপ মহানবী (সাঃ) কে ভালোবাসতে হলে তাঁর আহলে বাইতকে অবশ্যই ভালবাসতে হবে। মূলকথা আহলে বাইতের ভালোবাসাই মহানবী (দঃ)-এর ভালোবাসা। সুতরাং আল্লাহর ভালোবাসার নিম্নতম হল আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা। সে জন্য আল্লাহ আহলে বায়েতকে পবিত্র করে দিয়েছেন।

তাফরিরুস শাহাদাতাইনে লিখিত আছে ঃ "হাদিসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত মহানবী (সাঃ) এর হাকিকতের মধ্যে দু'ভাগ হয়ে ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর মাঝে শামিল হয়েছে। মহানবীর সুন্নাত এবং সীরাত হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মাধ্যমেই ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় লাভ করেছেন। সুতরাং পাক পাঞ্জতন অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত ফাতেমা (রাঃ), হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হোসাইন (রাঃ) পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মত একদেহ বিশিষ্ট। পাক পাঞ্জতনের প্রত্যেক সদস্যের প্রতি মহব্বত রাখা সকল মুসলমানের উপর ফরয।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস কেননা মহান আল্লাহ তাঁর নেয়ামত হতে তোমাদিগকে রিজিক প্রদান করেছেন। আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে আমাকে ভালোবাস। আর আমার ভালোবাসা পেতে হলে আমার আহ্‌লে বাইতকে ভালোবাস।" (মেশকাত, তিরমিজি)

পাক পাঞ্জতনের প্রতি যে সব মুসলমানের ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রেম, অনুরাগ-ভালোবাসা নেই তার কালেমার প্রতিও বিশ্বাস নেই। তারা যে কোন সময় ইবলিসের মত কালেমার মর্যাদা নষ্ট করতে পারে।

আল্লাহর বাণীর সমষ্টিই আল কোরান। যার ভিত্তিমূলে রয়েছে গতিময়তা দানকারী শক্তি-পাক পাঞ্জতন। এভাবেই "কোরান আহ্‌লে বাইতের অবিচ্ছেদ্য" নবীর উক্ত বাণী যারা শুনেছেন, মেনেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন তারাই প্রকৃত মুমিন। আর যারা জানতে চাননি বা জেনেও মানতে চাননি, তারা নির্বোধ। যারা তা বিশ্বাস করে না বরং বিরোধিতা করে তারা প্রকৃত মুমিন হতে পারে না। ইয়াজিদপন্থী আলেমগণ মহররম-এর দশ তারিখে আশুরা পালন করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করে, আর ইমাম হোসাইন (রাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং বন্ধু-বান্ধবদের ধর্মের জন্য নির্যাতিতভাবে শাহাদত বরণের নিমিত্তে শোক দিবস ইত্যাদি পালনে নিরুৎসাহিত করেন। ইমাম হোসাইনের বিষাদগ্রস্ত অবস্থার আলোচনা, আহাজারী ও মাতম করাকে হারাম বলে গণ্য করে এবং কোর্মা, পোলাও, বিরিয়ানী আহার করতে ও আনন্দমেলা বসাতে জনগণকে অনুপ্রেরণা দান করেন। অধিকন্তু তারা আরও বলে, ইমাম হোসাইনের (রাঃ) শাহাদত সংক্রান্ত আলোচনা, মাহফিল-মজলিস, শোক, মিছিল, গাশ্‌ত, গজল, কাছিদা, জারিগান ও মর্সিয়া ইত্যাদি কারবালার চর্চা নিষিদ্ধ। কারণ এতে নাকি অনেক মুসলমানের প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব ও শত্রুতার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে

এতে মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। আসলে তাদের উদ্দেশ্য হল মানুষ অন্য চর্চায় ব্যস্ত থাকুক, ইমাম হোসাইনের চর্চা বিলুপ্ত হউক। যাতে কেউ আর জানতে না পারে ইমাম হোসাইন কেন শহীদ হলেন? কি কারণে, কোন্ অবস্থায় শহীদ হলেন এবং কে বা কারা তাঁকে কোন্ অবস্থায় শহীদ করল।

তাঁদের ইচ্ছা ইয়াযিদপন্থী মুসলমানদের ধর্মদ্রোহিতা এবং তাদের অপকর্ম ও নবী পরিবারের প্রতি বিদ্বেষী আচার-আচরণ লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যাক। তবে তারা আহলে বাইতের দুশমনদেরকে সুকৌশলে বাঁচাবার জন্যে যত চেষ্টাই করুক না কেন মহান আল্লাহ কখনও তাদেরকে সফলকাম হতে দেবেন না।

পাষণ্ড ইয়াযিদ ও ইয়াযিদীদের বিরুদ্ধে কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি মুসলমান সোচ্চার থাকবে। হাদিস শরীফে আছে, যারা ওলি-আওলিয়াদের সংগে দুশমনী করে আল্লাহ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুগে যুগে যারাই ইমাম হোসাইনের শাহাদতের স্মরণে শোকানুষ্ঠান পালন-আয়োজনকে ঘৃণার চোখে দেখবে এবং তা উৎপাটিত করার চেষ্টায় থাকবে পরিণামে তারাই বিলুপ্ত হবে। তাদের অস্তিত্ব এমন কি তাদের স্মরণ করারও কেউ থাকবে না। মজলুম শহীদ ইমাম হোসাইনের শাহাদাত স্মরণে শোকানুষ্ঠানের আয়োজন ও পালন আজও পৃথিবীতে টিকে আছে এবং চিরকাল তা টিকে থাকবে।

ইমাম হোসাইন তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যথাযথ সত্যতার এক অনুপম সাবলীল কর্মের অনুকরণীয় এবং রক্তাক্ষরে লেখা অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত বিশ্ব ইতিহাসে রেখে গেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, কিন্তু সকল পার্থিব ঐশ্বর্য ও ভোগ বিলাসকে বিসর্জন দিয়ে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে আপন পরিবার-পরিজন নিষ্পাপ শিশুসন্তানসহ অতিপ্রিয় সঙ্গী-সাথী ও সুহৃদদের জীবনোৎসর্গের এমন অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আজও কোথাও পাওয়া যায় না। কারবালার স্মৃতি অনুষ্ঠানগুলোতে সপরিবারে বন্ধু-বান্ধবসহ ইসলামকে রক্ষা করার জন্য ইমাম হোসাইনের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়ার কথা স্মরণ হয়ে থাকে। যার অন্তরে কারবালার উপলব্ধি নেই সে কখনও নবীপ্রেমিক হতে পারে না।

ইমাম হোসাইন কোন মাজহাবের নন, কোন তরিকারও নন এমন কি কোন ফেরকা বা কোন দলের নন। তিনি আমার আপনার, তিনি পৃথিবীর সকল কল্যাণকামী লোকের। তিনি সমস্ত ধর্মপ্রেমিক লোকের।

রওজাতুশ শুহাদা গ্রন্থে বর্ণিত আছে, মহান আল্লাহ হযরত ফাতেমার নিকট ইলহাম করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত নবীজীর উম্মত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ইমাম হোসাইনের জন্য ক্রন্দন করবে। হযরত আব্দুল আজিজ মুহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ) ইররুশ্ শাহাদাতাইন গ্রন্থে লিখেছেন ইমাম হোসাইনের দুঃখে কান্না এবং শোক পালনাদি যা কারবালার হৃদয় বিদারক ও মসিবতপূর্ণ বর্ণনার করুণ দৃশ্য প্রদান করে

তা কিয়ামত পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

শহীদদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে এমন একটি উদ্দেশ্য নিহিত থাকে যা জাতির উন্নতি এবং মুক্তির প্রধান উপকরণ। প্রতিটি জাতিই নিজেদের শহীদদের সম্মান রক্ষার্থে তাঁদের স্মৃতি জাগ্রত রাখার জন্য ঘটা করে যে উপায় ও পন্থা অবলম্বন করে তার ইয়ত্তা নেই। আমাদের বাংলাদেশেও এর কোন বিপরীত প্রক্রিয়া দেখা যায় না। ভাষা আন্দোলনে যে সব ব্যক্তি নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন তাঁদের সম্মানার্থে তাঁদের স্মৃতি জাগ্রত রাখার মানসে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে বিভিন্ন স্থানে শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতি বছর বাংলাদেশের জনগণ তাঁদের সম্মানার্থে প্রভাতফেরী, খালি পায়, খালি মাথায় দাঁড়িয়ে যথাযোগ্য উদ্দীপনা ও মর্যাদার সাথে শোক দিবস পালন করেন। ভাষা শহীদদের স্মৃতিসৌধেও পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন এবং তাঁদের স্মরণে দেশাত্মবোধ সংগীত পরিবেশন করেন। গানগুলি এই

১ম গান ঃ আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি

২য় গান ঃ ছালাম ছালাম হাজার ছালাম
শহীদ ভাইয়ের স্মরণে

৩য় গান ঃ এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনল যারা
আমরা তোমাদের ভুলব না, ভুলব না।

অথচ শহীদদের নেতা মজলুম ইমাম হোসাইন (রাঃ) এমন এক ক্রান্তিলগ্নে ইসলামকে রক্ষা করলেন যখন ইসলামের তরী ধর্মহীনতার তুফানে ডুবে যাচ্ছিল। ইসলামের চরম শত্রু মদখোর, লম্পট ইয়াজিদ ও তার অনুসারীরা মহানবীর (সাঃ) প্রতিষ্ঠিত ইসলামের পবিত্রতা ধ্বংস করতে চেয়েছিলো। মহানবীর নয়নমণি বেহেশতের যুবকদের নেতা ইমাম হোসাইন (রাঃ) তিনদিন অনাহারে ও পিপাসার্ত অবস্থায় মুষ্টিমেয় সঙ্গী-সাথীসহ সপরিবারে আপোষহীন সংগ্রামের মধ্যদিয়ে কারবালার মরু প্রান্তরে নিজ জীবনোৎসর্গ করে ইসলামের ডুবন্ত তরী অবিশ্বাসী মুনাফিকদের কবল থেকে রক্ষা করেছেন এবং মুসলিম উম্মাহকে জাহান্নামের নরকানল থেকে চিরতরে বাঁচিয়েছেন। সে জন্যই তো ইমাম হোসাইন আমাদের উদ্ধার তরী 'সফীনাতুন্ নাজাত্'।

মহানবী (সাঃ) পবিত্র ইসলামের যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, ইমাম হোসাইন (রাঃ) সেই ভিত্তিকে শক্তিশালী ও মজবুতভাবে উপস্থাপন করে দেখিয়ে গেলেন তার পূত-পবিত্র জীবন "ইসলামের দর্শন" স্বরূপ। তাঁর শাহাদাতের ফলে আত্মিক ও সাত্মিক উভয় প্রকার বিজয় সংঘটিত হয়েছিল। ইসলাম প্রচার যেমন প্রতিটি মুসলমানদের উপর ফরয তদ্রুপ ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের স্মরণে শোকানুষ্ঠান পালন করাও প্রতিটি নবীপ্রেমিক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য।

স্মারক অনুষ্ঠান পালনের দৃষ্টান্ত আমরা মহানবীর (সাঃ) পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত ইসমাইল (আঃ) এবং হযরত বিবি হাজেরা (আঃ) থেকে প্রাপ্ত হই। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নবজাত শিশু হযরত ইসমাইল (আঃ) কে কিছু খাবার ও কিছু পানি সহ নির্জন মরুপ্রান্তরে মহান আল্লাহর আদেশে রেখে আসেন। পানি ফুরিয়ে গেলে বিবি হাজেরা (আঃ) পানির জন্য "সাফা-মারওয়া" পাহাড়দ্বয়ে ছুটাছুটি করেন। বিবি হাজেরার সেই দৌড়াদৌড়ি ও স্মৃতিরক্ষার্থে মহান আল্লাহ সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ অর্থাৎ দৌড়ানও হজ্বের অঙ্গরূপে বিধান করে দেন। বিবি হাজেরার সেই দৌড়া-দৌড়ির পবিত্র ব্রত আজও প্রতিটি হাজী পালন করে থাকেন, যাতে ঐ অধিশ্রিত কীর্তি চির জাগরুক থাকে। হজরত ইসমাঈল (আঃ) কে কুরবানী করার জন্য যখন মীনায় নেওয়া হয় তখন তিনটি শয়তান তিনটি স্থানে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে। উক্ত তিন স্থানেই ঐ তিন শয়তানকে ঘৃণাভরে হাজীরা কঙ্কর নিক্ষেপ করেন। তাঁদের এ কৃতকর্মের স্মরণার্থে ঐ তিনটি স্থানেই তিনটি স্তম্ভ করে রাখা হয়েছে। স্তম্ভ তিনটিকে বড় শয়তান, মধ্যম শয়তান ও ছোট শয়তান বলে অভিহিত করা হয়। প্রতি বছর হজ্জের মৌসুমে প্রত্যেক হাজীকেই ঐ তিনস্থানে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়। সেখানে শয়তানকে বেঁধে রাখা হয়নি। শুধু এ পৃথিবীর মানুষের স্মৃতিতে জাগ্রত রাখার নিমিত্তে কঙ্কর নিক্ষেপও হজ্জের অঙ্গ করে দেয়া হয়েছে। হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) বেহেশত থেকে অবতরণ করার পর ঐতিহাসিক আরাফাতে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। তাঁদের স্মরণে অনুষ্ঠিত হয় অকুফে আরাফা (আরাফাত প্রান্তরে অবস্থান) হাজীদের ঐ সব কাজকে জড়-পূজা বলা হয় না। তদ্রুপ ইমাম হোসাইনের স্মরণ মানবসমাজে জাগ্রত থাকার জন্য বিভিন্ন প্রকার শোকানুষ্ঠানও জড়-পূজা নয়। আল্লাহর ওলীগণের পুণ্য স্মৃতি ও নিদর্শনসমূহ, যেমন পবিত্র মাজার শরীফে বসার স্থান পূর্ণ মর্যাদার সাথে সংরক্ষণ করার জন্য সেগুলো ভক্তিভরে চুম্বন করা, ফুল, গিলাফ, আতর বাতি দিয়ে সাজানোও জড়-পূজা নয়। এতে ওলীগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। ওলীগণকে সম্মান করাই আল্লাহকে সম্মান করা। অলীগণের মহব্বতেই আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি পায়। কারণ তাঁরা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত এবং ধর্মের নিদর্শন। তাদের স্মরণে আয়োজিত বিভিন্ন প্রকার আচার-অনুষ্ঠানকে জড়-পূজা মনে করা অজ্ঞতারই পরিচায়ক। যে সব স্মারক অনুষ্ঠান ও কার্যক্রম সত্যাশ্রয়ী লোকদের মনে অনুপ্রেরণা দান করে তা কখনও হারাম হতে পারে না বেদয়াতও হতে পারে না। যদি ওসব ব্যাপারে কোরান কিংবা সুন্নাহর প্রত্যক্ষ নিষেধাজ্ঞা না থাকে। ফাতাওয়ায়ে আফ্‌রিকায় ১০০ পৃষ্ঠায় হযরত আহমদ রেজা খান সাহেব লিখেছেন তিরমিজি ও ইবনে মাজা হাদিস শরীফে হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যা কিছু আল্লাহপাক তার কিতাবে হালাল বলে উল্লেখ করেছেন তাই হালাল, আর যা হারাম বলে উল্লেখ করেছেন তাই হারাম। যার সম্পর্কে কিছুই বলেননি তা মাফ (অর্থাৎ তাহা মুবাহ)। উক্ত কিতাবের ৯৩ পৃষ্ঠার হাসিয়ায় উল্লেখ আছে প্রত্যেক মুবাহ কাজ পবিত্র নিয়তের

কারণে মুস্তাহাব হয়ে যায়।

উক্ত কিতাবের উক্ত পৃষ্ঠার হাসিয়ায় এটিও উল্লেখ আছে নবীগণ ও আওলিয়াগণের সম্মানার্থে যত নতুন তরিকাই সৃষ্টি করা হয়, যদি এর সম্পর্কে শরিয়তের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা না থাকে তাহলে এসব মুস্তাহছান। (অর্থাৎ ছওয়াবের কাজ)। যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত শহীদদের জন্য যে কোন ধরনের শোক ও ক্রন্দন করাটাকে নাজায়েয বলে মনে করে তারা ইউসুফের (আঃ) বিচ্ছেদ ব্যাথায় ইয়াকুব (আঃ) যে দিবারাত্রি ক্রন্দন করেছিলেন-এ প্রসঙ্গে কি বলবে? পবিত্র কোরানে এরশাদ হচ্ছে, "তাঁর (ইয়াকুবের) চক্ষুদ্বয় শোকে কাঁদতে কাঁদতে সাদা হয়ে গিয়েছিল। (সূরা ইউসুফ ঃ ৮৫)

শত দুঃখ-কষ্ট-বেদনা ও শোকের মাঝেও ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফকে (আঃ) ভুলতে পারেননি। যতই তাঁদের মিলনের দিন ঘনিয়ে আসতে লাগলো ততই ইয়াকুবের (আঃ) মাঝে ইউসুফের সাথে মিলনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বেড়ে গেলো। পবিত্র কোরানে বর্ণিত হয়েছে ঃ "আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি যদি না তোমরা মিথ্যে বলে থাকো। " (সূরা ইউসুফ ঃ ৯৪)

ইউসুফের (আঃ) জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি তীব্র প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা প্রদর্শন যদি সঠিক কাজ ও আল্লাহ্‌র তৌহীদের অনুকূল হয়ে থাকে তাহলে তাঁর ওফাতের পর তা কিভাবে বিদয়াত ও হারামে পর্যবসিত হবে?

আর আজকে যখন শোকে ইয়াকুব সাদৃশ্য মুমিনগণ তাদের কোন ওলী যেমন পুণ্যাত্মা ইমামদের (যারা বিপদ-মুসিবতের দিক থেকে ইউসুফ সাদৃশ্য) স্মরণে শোকানুষ্ঠানে সমবেত হন এবং সেই পুণ্যবান ওলীর পুণ্য স্মৃতিকে জাগরুক করেন বিভিন্ন বক্তৃতা, কাসীদা, শোক-গাঁথা পাঠের মাধ্যমে, তাঁর জীবন চরিত আলোচনা করেন এবং তার জন্য অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শোকাশ্রু প্রবাহিত করেন তখন এসব কিছুর অর্থ কি এই হবে যে, তারা উক্ত ওলীর পূজা করলেন?

আল্লামা শিবলী নোমানী সিরাতুন নবী ১ম খণ্ডের ৩৫৫-৫৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ওহুদের যুদ্ধের পর হযরত নবী করিম (সাঃ) যখন মদিনায় ফিরে আসলেন-তখন সমগ্র মদীনায় শহীদদের জন্যে মাতম হচ্ছিল। তিনি যে দিকে যেতেন সেদিক থেকে মাতম এর আওয়াজ শুনা যেত। এ সময় আবেগাপ্লুত অবস্থায় নবী (সাঃ) বললেন, হায়! হামজার জন্য কোন ক্রন্দনকারী নেই। আনসারগণ এ কথা শুনা মাত্রই কেঁপে উঠলেন এবং সকলে বাড়ীতে গিয়ে নিজ নিজ স্ত্রীকে আদেশ দিলেন যে, তোমরা হামজার ঘরে গিয়ে মাতম কর। হযরত দেখলেন দরজাসমূহে পর্দানশীন আনসার মেয়েদের ভীড় এবং তারা হামজার জন্য মাতম করছেন। তিনি তাদের জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের হামদরদীর জন্য শুকর গুজার করছি। এ ঘটনার পর বহু যুগ পর্যন্ত এ নিয়ম ছিল যে, যখন কারো জন্য মাতম করা হত তখনই হযরত হামজার ঘটনা

উল্লেখ করে মাতম শুরু করা হতো এবং এটি (নিছক কোন নিয়ম) ছিল না। বরং হযরত হামজার জন্য প্রকৃত মহব্বত ছিল। মানুষের বিবেক স্বভাবতঃই এ কথা বলে যে, কোন অত্যাচারিত, মুস্তাদআফিন, ঘর-বাড়ী ছাড়া আশ্রয়হীন-এর প্রতি সহানুভূতি এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করা উচিৎ। কোন মানুষের অন্য মানুষের প্রতি নৈকট্য ও স্নেহ-মমতা যত বেশী হবে তত বেশী হবে উক্ত মায়ার মানুষের দুঃখ এবং সুখের সঙ্গে অংশ নেয়া। বন্ধু, প্রিয়জন, আত্মীয়, ভাইবোন ও পিতা-মাতা সবচেয়ে উচ্চে পীর মুর্শিদ এবং পথপ্রদর্শক-এর খুশীতে-খুশী, দুঃখে দুঃখী হওয়া মানুষের জন্মগত চিরন্তন অভ্যাস। মানুষ নিজ আত্মীয়-স্বজনের দুঃখে ক্রন্দন করে, হা-হুতাশ করে, এমন কি অস্থির অবস্থায় বুক ও মাথায় হাত মারে। এক্ষেত্রে মহানবীর (সাঃ) নয়নমণি সাইয়্যেদুশ শুহাদা আল্লাহ্‌র পথের মুজাহিদ, কওম এবং জাতির স্বার্থে নিবেদিতপ্রাণ হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর জন্য চোখের দু'ফোঁটা অশ্রুপাত করা, তাঁদের শানে মর্সিয়া পাঠ, মাতম ইত্যাদি করাতে দোষারোপ করা কি ইনসাফ হবে? ধর্মের জন্য, ইসলাম রক্ষার জন্য যিনি ইতিহাসের সব চাইতে বড় কোরবানী দিয়েছেন, তাদের শানে মাতম, মর্সিয়া ইত্যাদি করতে ইসলাম এবং কোরানে কোন নিষেধ নেই বরং একে রহমত বর্ষণের মাধ্যম, মাগফেরাতের ওছিলা হিসাবে গণ্য করা যায়। ইসলাম রক্ষার্থে যারা শহীদ হয়েছেন তাঁদের জন্য শোক, মাতম পালন করা আল্লাহ্‌র ভয়ের (খাশিয়াতিল্লাহ্‌র) একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহ্ এবং রাসূল (সাঃ)-এর মাহবুব এবং প্রিয় শহীদানের নেতার জন্য ক্রন্দন করা নিঃসন্দেহে সওয়াবের কাজ।

হযরত আদম (আঃ) নিজ প্রথম সন্তান এবং শহীদের (হাবিলের) জন্য ক্রন্দন করেছেন, মর্সিয়া পড়েছেন এবং হাসি বর্জন করেন। তফসিরে খাজেন পৃঃ ৪৫, মোয়াল্লেম, কবীর এবং রওজাতুল আহবাব ১ম খণ্ড পৃঃ-১৬

হযরত রাসূল (সাঃ) হযরত আমীর হামজার শাহাদাত এবং মৃতদেহ দেখে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে ক্রন্দন করেছিলেন। (মেরাজুল নাবুয়্যাত পৃঃ-১২৩, মাদারেজুন নাবুয়্যাত, ইব্‌নে খালদুন ৩য় খণ্ড পৃঃ-১০৮ কানজুল আমাল ৮ম খণ্ড পৃঃ-২১)

হযরত রাসূল মাকবুল (সাঃ) নিজ চাচা আবু তালেব এবং বিবি খাদিজাতুল কোবরার ওফাতে অনেক বেশী ক্রন্দন করেন এবং শোক প্রকাশ করেন। ঐ বৎসরে নাম রাখা হয় (আম্‌উল হুজন) অর্থাৎ ক্রন্দনের বৎসর। (রওজাতুসসাফা ২য় খণ্ড পৃঃ ১৪৬)

হযরত রাসূলে খোদা (সাঃ) নিজ সন্তান ইব্রাহিমের মৃত্যুতে খুব ক্রন্দন করেন এবং বলেন-চক্ষু অশ্রু বিসর্জন করছে অন্তরও শোকাচ্ছন্ন আল্লাহ্‌র উপর সন্তুষ্টি থাকা ব্যতীত আর কিছু বলি না। হে ইব্রাহিম আমি তোমার বিচ্ছেদে শোকাভিভূত।

(মেশ্‌কাত বাবুল বাকা আলাল মাইয়াত পৃঃ-১৫০)

হযরত রাসূলে খোদা (সাঃ)-এর ওফাতে আহলে বায়তে আজাম, সাহাবায়ে কেরাম, নবী পত্নীগণ ক্রন্দন করেন, মাতম করেন, মর্সিয়া পড়েন। সাহাবাগণের কেউ কেউ নবীর বিচ্ছেদে দাঁত ভেঙ্গে ফেলেন, অন্ধ এবং পাগল হয়ে যান। কেউ দেশ ছেড়ে দেন, তাঁদের হুঁশজ্ঞান ছিল না। নবীর বিচ্ছেদে উসতুনে হানানা খেজুরের কাষ্ঠ ক্রন্দন করে এবং সমস্ত মদীনাবাসী শোকাচ্ছন্ন হয়।

(মেশকাত বাব উফাতুননবী রওজাতুসসাফা ২য় খণ্ড পৃঃ ১৮ ইব্‌নে খালদুন ২য় খণ্ড পৃঃ ২৫৯ কিতাব রওজাতুল আহবাব)

হযরত বিবি আয়েশা রাসূলুল্লাহ্‌র ইন্তেকালের পর উনার মাথা মোবারক বালিশের উপর রেখে নিজের হাতে মুখে মারতে থাকেন। (মাদারেজুন নাবুয়্যাত ২য় খণ্ড পৃঃ ৯৯-৭১৭)

হযরত বিবি আয়েশা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর মহিলাদের নিয়ে মুখ ও মাথা পেটা শুরু করেন। (তারিখে তাবারী ৩য় খণ্ড পৃঃ-১৯০)

ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ) দামেস্ক হতে মুক্তি পাওয়ার পর সব আহলে বায়েতসহ কাফেলা নিয়ে ২০ সফরের পর মদীনার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছলে শাহাদতের সংবাদ সবাই পেয়ে গেলেন তখন সব নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ মদীনা থেকে বের হয়ে কাঁদতে কাঁদতে চীৎকার ও মাতম করে কাফেলার সঙ্গে মিলিত হন। ইমাম ভ্রাতা হযরত মোহাম্মদ হানাফিয়া ক্রন্দন করতে করতে বেহুঁশ হয়ে যেতেন।

(নূরুল আইন ফি মাসহাদিল হোসেইন আরবী পৃঃ ৬২-৬৩)

হাসান বসরী, বারী বিন খাসিম, আবদুল্লা বিন জুবায়ের ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর শোকে মাতম করেছেন এবং তাদের উপর লানত দিয়েছেন যারা ইমামের বিরুদ্ধে ছিল এবং যারা এই নজীরবিহীন হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল। (তাজকেরাতুল খাওয়াসুল উম্মাত)

ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর স্মরণ (ইয়াদগার) কে তাজা করা রাসূল (সাঃ)-এর আদর্শ, নবী বংশের সুন্নত এবং সাহাবায়ে কেরাম এবং সলফে সালেহীনদের তরীকা এবং ইমাম (আঃ)-এর জন্যে শোক করা সওয়াব-এর কাজ এবং নাজাতের উপায়। কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনার স্মরণে শোকানুষ্ঠান পালন কোন মানুষকেই মিথ্যার প্রতি, অধর্মের প্রতি, নবী ও নবী পরিবারের বিদ্বেষের প্রতি উৎসাহিত করে না। এটা সবার জানা রয়েছে। আসলে কারবালার ঐ মর্মান্তিক ঘটনা পবিত্র ইসলাম ধর্মকে রক্ষা করার জন্যই সংঘটিত হয়েছে। ইমাম হোসাইনের মহব্রত ও জালিমের জুলুমের প্রতি বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা সৃষ্টিকারী হিসেবে কারবালার মর্মান্তিক শোকাবহ ঘটনার স্মরণে শোকানুষ্ঠানে পালন না করার কোন সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ পবিত্র কোরান কিংবা হাদিসে নেই। বরং তা সংগত কারণে অত্যন্ত জরুরী।

মহানবী (সাঃ)-এর ইন্তেকালের প্রায় পঞ্চাশ বছর পর কারবালার ঐ নজীর বিহীন মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয়। মহানবীর জীবদ্দশায় যদি কারবালার ঐ মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হতো তাহলে তিনি হয়তো ভবিষ্যতে স্মরণ করার জন্য একটা সমীচীন ব্যবস্থা করে যেতেন।

বারবার কেউ যদি কোন মর্মান্তিক ঘটনা স্মরণ করে এর পর্যালোচনা করে তবে এর কিছু না কিছু প্রভাব তার মধ্যে অবশ্যই আসবে। এটা কারো অজানা নয়।

কারবালার ঘটনাবলী বার বার পর্যালোচনা করলে বা বার বার স্মরণ করলে যে সব অপকর্মের ফলে পৃথিবীতে ইয়াযিদিগণ আজও ঘৃণিত-নিন্দিত তা থেকে মানুষ দূরে থাকতে চেষ্টা করবে।

হযরত আবুজর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম (সাঃ) কে কাবা ঘরের দরজা ধরে বলতে শুনেছি, নিশ্চিত জেনে রাখ আমার আহ্‌লে বাইত নূহ (আঃ)র নৌকার মত। যারা ঐ নৌকাতে আরোহণ করেছে তারা নিষ্কৃতি পেয়েছে, যারা পশ্চাদপসরণ করেছে অর্থাৎ নৌকাতে আরোহণ করেনি তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। (মেশকাত)

অর্থাৎ যারা আহ্‌লে বাইতকে সর্বান্তকরণে ভালবাসেন, প্রকাশ্যভাবে তারা তাদের আচার-ব্যবহারে, কথাবার্তায়, ভালবাসার পরিচয় দিতে কোন প্রকার সংকোচবোধ করেন না। মজলিসে-মাহ্‌ফিলে তাঁদের গুণকীর্তন করতে আনন্দ পান। যে মাহ্‌ফিলে তাঁদের গুণকীর্তন করা হয়, সেই মাহ্‌ফিলকে এমন কি মাহ্‌ফিলের সে স্থানটিকেও তারা যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। গজল, কাসিদা, জারিগান ও মর্সিয়ার মাধ্যমেও আহ্‌লে বাইতের প্রশস্তি গেয়ে থাকেন বা শোনেন। তাঁদেরকে তারা ঘৃণার চোখে দেখেন না। তাঁদের শত্রুকে শত্রু মনে করেন। তাঁদের মিত্রকে মিত্র জ্ঞান করেন, তাঁদের শোক দিবসে শোক প্রকাশ করেন, তাঁদের আনন্দের দিনে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং তাঁদের নির্দেশগুলো সদানন্দে তামিল করেন। এমন কি কেউ কেউ আহ্‌লে বাইতের মহব্বতে বিগলিত হয়ে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দেন। তারাই নাজাতপ্রাপ্ত। আর আরেকটি দল আহ্‌লে বাইতকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে না ও প্রকাশ্যভাবে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির পরিচয় দিতে নারাজ বা লজ্জাবোধ করে। পক্ষান্তরে, যারা আহ্‌লে বাইতের প্রশংসা ও গুণ কীর্তন করে, তাদের প্রতিও ঘৃণার মনোভাব রাখে, আহলে বাইতের গুণাগুণ কীর্তন ও পুণ্য স্মৃতির চর্চা যাতে না হতে পারে সে দিকেও নানা প্রকার কূটকৌশল অবলম্বন করে, আহ্‌লে বাইতের প্রেমিকগণের দোষত্রুটি অন্বেষণ করে বেড়ায়, যাতে কোন না কোন উপায়ে তাদেরকে জব্দ করা যায় (তারা মনে করে ইমামের প্রেমিকগণ জব্দ হয়ে গেলে ইমামের চর্চা আর হবে না) তারা যে নিজেরা কত দোষী সেদিকে তাদের মোটেই ভ্রুক্ষেপ নেই। তারা স্বীয় অন্যায় আচরণ উপেক্ষা করে পরচর্চায় এবং পরনিন্দায় ব্যস্ত হয়ে সময় কাটায়। তারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত তারাই জাহান্নামী। বিশেষ করে

'আহ্‌লে বাইত নূহ নবীর তরী'র ব্যাপারটি অতি সঙ্গীন। যার উপর নাজাত নির্ভর করে। শিয়াগণ নবীপরিবারের প্রতি ভালবাসার ও অনুসরণের কথা বলে। শিয়াদের প্রতি কারও কারও বিদ্বেষ যেন আমাদেরকে নবী পরিবারের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে না তুলে। জেনে রাখুন–আহ্‌লে বাইতের তরী নৌকা ব্যতীত মুক্তি বা নাজাতের আর কোন উপায় নেই।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, আমার মসজিদে (মসজিদে নববী) আমি, আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন ব্যতীত সকল প্রকার ঋতুবতী মহিলা ও নাপাক অবস্থায় পুরুষের প্রবেশ (নিষিদ্ধ) হারাম। (দারে কুত্‌নী, মাজাহারে হক)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার বংশধরদের আওলাদের উপর দরূদ না পড়ে, শুধু আমার উপর পড়লো আল্লাহ পাক তার দরূদ কবুল করবেন না। (দারে কুতনী, বায়হাকী)

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন–মহানবী (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার মহব্বতের কারণে আমার আহ্‌লে বাইতকে মহব্বত করবে না সে মোমেন হতে পারবে না।

শেফা শরীফে বর্ণিত আছে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, আমার বংশধরদের মর্যাদা ও সম্মানের পরিচয় লাভ করা দোজখ হতে মুক্তির কারণ। আমার বংশধরদের মহব্বত পুলছিরাত পার হওয়ার কারণস্বরূপ। এরূপ মাদারেজুন্নুবুয়ত উর্দু তরজমা ১ম খণ্ড ৫৪৪ পৃষ্ঠায়ও উল্লেখ আছে, মুহাম্মদ (সাঃ)–এর বংশধরদের প্রতি ভালোবাসার আকিদা বিশ্বাসী আদর্শে দোজখ হতে মুক্ত।

তাফসীরে কাশশাফ ও তাফসীরে কবীরে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি মহানবীর (সাঃ) আওলাদের মহব্বত নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে হযরত আজরাইল (আঃ) ও মুনকীর–নাকীর তাকে বেহেশ্‌তী বলে শুভ সংবাদ দেবেন। যে ব্যক্তি মহানবী (সাঃ)–এর বংশধরদের মহব্বত নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে সে সম্পূর্ণ ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে। যে ব্যক্তি মহানবীর (সাঃ) বংশধরদের প্রতি বিদ্বেষভাব নিয়ে মরবে কিয়ামতের দিন তার কপালে এ কথা লেখা থাকবে "সে আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত"।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত মহানবী (সাঃ) বলেছেন, আমার কন্যা ফাতেমা এবং তাঁর ভক্তবৃন্দকে আল্লাহ পাক দোজখের আগুন হতে মুক্তিদান করেছেন। (নেছায়ী শরিফ)

মাদারেজুন্নুবুয়তের উর্দু তরজমা ২য় খণ্ড ৭৮৭ পৃষ্ঠায় ও এ মত উল্লেখ আছে। হযরত উম্মে আতিয়া হতে বর্ণিতঃ মহানবী (সাঃ) বলেন, হে খোদা তুমি আমার ওফাত করিও না। (মেশ্‌কাত, তিরমিজি)

মৌলানা ইসমাইল শহীদ "মানছাবে ইমামাতে" এ হাদিস উল্লেখ করেছেন,

মাজাহারে হকেও এ হাদিস বর্ণিতঃ মহানবী (সাঃ) দোয়া করেছেন, "হে আল্লাহ যেখানে আলী যাবে সেখানে তাঁর সাথে সত্যকে প্রবাহিত করে দাও।" এই একই গ্রন্থে আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় আলী কোরানের সাথে ও কোরান আলীর সাথে। উক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আলী ও কোরান অবিচ্ছিন্ন। যেখানে হযরত আলীর অবস্থান, সেখানে কোরান উপস্থিত। হযরত আলী বলতেন, "আমি সবাক কোরান ইহা নির্বাক কোরান। হাদিসে সাকালাইনের দ্বারাও প্রমাণিত হয় আহলে বাইত অর্থাৎ হযরত আলী, হযরত ফাতেমা, হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন (রাঃ), সবাই কোরানের অবিচ্ছিন্ন সঙ্গী। কোরানও তাঁদেরকে ছাড়বে না, তাঁরাও কোরানকে ছাড়বেন না। আহ্‌লে বাইত আর কোরান পরস্পর চিরসাথী। অতএব তাঁদের অনুসরণ, অনুকরণ, ভালোবাসা ও গোলামীই নাজাতের সরল পথ। মানসাবে ইমামতের ১৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে আলী–প্রেম পুণ্যের কাজ। আলী বিদ্বেষ এমন পাপ যার পুণ্য উপকারে আসে না। খারিজী মতপুষ্টগণ মুসলমান পরিচয়ধারী হলেও উচ্চমানের নামাজ, রোজা, কোরান তেলাওয়াত ইত্যাদি গুণের অধিকারী আলী বিদ্বেষের অভিশাপে তাদের নেক ধ্বংস হয়ে যায়। সৎকাজ উপকারে আসে না। খারিজী মতবাদ–পুষ্টগণ হযরত আলীর উপর বিদ্বেষ পোষণ করে। আলী বিদ্বেষের কারণে তারা নামায–রোজা করেও উপকৃত হতে পারেনি। তদ্রুপ ইয়াজিদী মুসলমানগণের নামাজ, রোজা, ইবাদত বন্দেগী, দাড়ি–পাগড়ী, টুপী কিছুই উপকারে আসবে না ইমাম হোসাইনের শত্রুতার কারণে। কারণ মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইনের সংগে যারা যুদ্ধ করে আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করি।" (দ্রঃ মেশকাত)

অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে মহান আল্লাহ বলেছেন, যারা আলীর সঙ্গে শত্রুতা রাখে আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করি। (দ্রঃ মেশকাত)

আহলে বাইত হতে বড় ওয়ালী বা অভিভাবক আর কে হতে পারে? তাঁদের ফয়েজ ও বরকতেই পৃথিবীতে আল্লাহর বান্দাগণ ওয়ালী ও আওলিয়া হয়েছেন।

মাদারেজুন্নুবুয়ত উর্দু তরজমার ২য় খণ্ডে উল্লেখ আছে ফাতেমা ও ফাতেমার প্রেমিকগণকে মহান আল্লাহ জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি দান করেছেন। অর্থাৎ আহ্‌লে বাইতের প্রতি প্রেমভক্তি রেখে কোরানের আমল করলে অতি সহজেই বেহেশতে যেতে পারবে। অন্যথায় আহ্‌লে বাইতের ভক্তিপ্রেম ছেড়ে দিয়ে শুধু নামাজ–রোজা, ইবাদত–বন্দেগীতে মশগুল থাক্‌লেও সে সব আমলের দ্বারা মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন না। খারিজী ও ইয়াযিদী মুসলমানগণের ইবাদত–বন্দেগী, দাড়ি–পাগড়ী–টুপী সবই ছিল, কিন্তু আহ্‌লে বাইতের মহব্বত ছিল না। যদি তাঁদের প্রতি সত্যিকার মহব্বত থাকতো, তাহলে খারিজীগণ কুফার মসজিদে হযরত আলী (রাঃ)কে শহীদ করতে পারতো না। ইয়াযিদী মুসলমানগণও তাঁর পরিবারবর্গের উপর

এরূপ অমানুষিক জুলুম করে শহীদ করতে সক্ষম হতো না। শাহাদাতের পর তাঁদের পবিত্র লাশকেও চরমভাবে পদদলিত করতে কিছুতেই তাদের প্রাণে সায় দিত না।

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত মহানবী (সাঃ) বলেছেন, যারা আহলে বাইতকে ভালোবাসে তারা খোদাভীরু (মুত্তাকীন)। যারা আহলে বাইতকে ভালোবাসে না, তারা দুর্ভাগা মুনাফিক। (মুল্লা আলী কারী)

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত–আমি মহানবীকে (সাঃ) আরাফার দিবসে বিদায় হজ্বে কোসওয়া নামক উটে বসে বলতে দেখেছি, তিনি বলেছেন, হে মানুষেরা আমি তোমাদের মধ্যে দুটি অতি মহান ভারী জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি তা আঁকড়ে ধর তাহলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে, কিতাবুল্লাহ (কোরান) এবং আমার আহ্‌লে বাইত (ইতরাত্)। (মেশ্‌কাত, তিরমিজী)

মেশ্‌কাত মুসলিম ও তিরমিজী গ্রন্থসমূহে হযরত জায়েদ ইব্‌নে আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত (হাদীসে সাকালাইন) আছে–মহানবী (সাঃ) বলেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে অতীব মূল্যবান ও সম্মানিত দুটো জিনিস রেখে গেলাম। একটি হচ্ছে কিতাবুল্লাহ আল কোরান আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমার আহ্‌লে বাইত। হযরত জায়েদ ইব্‌নে আরকাম (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত–এ দু'টো জিনিস হাউসে কাওসারে আমার সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত কখনও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। (দ্রঃ মাজাহিরে হক ১৪৫ ও ১৫২ পৃঃ)

এই পবিত্র আমানতদ্বয়কে পরস্পর হতে যারা বিচ্ছিন্ন করেছে অর্থাৎ আহলে বাইতকে কিতাবুল্লাহ হতে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং আহলে বাইতকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি বরং তাঁদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছে তারা কখনও মোমেন হতে পারে না। তারাই জগতে খারিজী মুসলমান ও ইয়াযিদী মুসলমান নামে অভিহিত। তারাই মহানবী (সাঃ) হতে নামাযের মর্যাদা দেয় অনেক বেশী। খারিজী মুসলমানদের মত নামাযী জগতে খুবই বিরল ছিল। তারাই হযরত মাওলা আলী (রাঃ)কে কুফার মসজিদের মধ্যে শহীদ করেছিল। তদ্রুপ ইয়াযিদী মাওলানা, মৌলভী ও নামাযীগণ নবীজীর কলিজার টুকরা ইমাম হোসাইন ও তাঁর সাথীদেরকে নির্মমভাবে কারবালার প্রান্তরে তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে শহীদ করে আনন্দ উল্লাস করেছিল। তারাই আহলে বাইতকে অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়ে শহীদ করে ধর্মকে পবিত্র করেছে বলে আত্মগৌরব বোধ করে। কারণ আহলে বাইত নাকি সমাজে শান্তি–শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী, রাষ্ট্রদ্রোহী, অধর্মের সহায়ক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার লোভী ছিলেন। (নাউজুবিল্লাহ)

ইয়াযিদী মুসলমানগণ বলে, তারা (আহলে বাইত) নবীর বংশধর হলে কি হবে, তাদের সব কথাই কি মানতে হবে ও তাদের সমস্ত কাজেরই কি সমর্থন দিতে হবে? তাদের এত লোভ কেন?(নাউযুবিল্লাহ) ইয়াযীদ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে। তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইলে ইয়াযীদের লোকজন তাদেরকে খাতির করতে পারে?

তাইতো ইয়াযিদ পক্ষীয় আলেমগণ ফতোয়া দিয়েছিল যে, ইমাম হোসাইনকে কতল করা জায়েজ। কারণ তিনি রাষ্ট্রদ্রোহী ও সমাজে ফিতনা সৃষ্টিকারী। আফজালুল আমাল ফি জাওয়াবেনা তায়েজুল আমাল নামক কিতাবের ২য় পৃঃ লিখিত আছে যে, হযরত ইমাম হোসাইন যখন এজিদের বশ্যতা স্বীকার করতে অসম্মত হন, তখন শ্যামদেশের (সিরিয়ার) ৩০০ শ' আলেম তাঁকে রাজদ্রোহী বলে হত্যা করার ফতোয়া দেয়। উল্লেখ্য, সিরিয় ছিল ইয়াযিদ ও তার পিতা মুয়াবিয়ার শাসনের রাজধানী।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, আমি দশই মহররম দুপুরের সময় মহানবী (সাঃ)কে স্বপ্নে দেখলাম তাঁর আলুলায়িত কেশ ধুলায় মলিন। অস্থিরচিত্তে মহানবী (সাঃ)কে বললাম, হযরত, আপনার এ অবস্থা কেন? উত্তরে তিনি বললেন, হোসাইন এবং তাঁর সংগীসাথীরা শহীদ হয়েছে, আমি এ শিশিতে তাদের রক্ত ভরে নিয়েছি। (দ্রঃ মেশকাত)

উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) দশই মহররম মহানবী (সাঃ)কে স্বপ্নে দেখেছেন, মহানবীর (সাঃ) মাথা এবং দাড়ি মোবারকে ধুলা মাটিতে ভরা। মহানবী (সাঃ) বললেন, হোসাইন যে স্থানে শাহাদত বরণ করেছে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। হযরত শেখ ফরিদ (রহঃ)–এর মালফুজাত "রাহাতুল কুলুবে" বর্ণিত আছে, যেদিন ইমাম হোসাইন শাহাদত বরণ করেন সে রাতে এক বুজুর্গ ব্যক্তি হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে স্বপ্নে দেখেন তিনি নবীর (ফাতেমা) স্ত্রীগণসহ কাপড়ের আস্তিন (দামান) কোমরে বেঁধে কারবালার যে স্থানে ইমাম হোসাইন (রাঃ) শহীদ হন, সে স্থানে ঝাড়ু দিচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে বেহেশতের রাণী মহানবীর সর্বাধিক প্রিয় কন্যা এ কেমন পবিত্র স্থান, যা আপনি আপনার কাপড়ের আস্তিন দ্বারা পরিষ্কার করছেন। উত্তরে তিনি বললেন, এ স্থানেই আমার হোসাইন শহীদ হবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সাঃ) খালি মাথায় মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে ইমাম হোসাইনের জন্যে শোক প্রকাশ করেছেন। দাড়ি এবং মাথার চুলে এ সময় ধুলা–মাটি লাগে, যখন মানুষ মাটিতে লুটালুটি করে।

আহলে বাইতের কিছু কিছু প্রেমিক এ দিকটা লক্ষ্য করে যদি খাট–পালঙ্ক বর্জন করে, খালি পায়ে, খালি মাথায় মাটিতে থেকে 'মজলুম হোসাইন'–এর অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে শোক প্রকাশ করে তাহলে এ ধরনের শোক প্রকাশকারীদের প্রতি ঘৃণার মনোভাব রাখলে মহানবীর (সাঃ) সন্তুষ্টি কি পাওয়া যাবে? উপরোক্ত শোকপ্রকাশের উদ্দেশ্যে তাদেরকে মন্দ বলা মহানবী (সাঃ)কে মন্দ বলার শামিল। কারণ মহানবী (সাঃ) রুহানী বেশে খালি মাথায় মাটিতে পড়ে শোক প্রকাশ করেছেন। ফতোয়ায়ে রাশিদিয়া গ্রন্থে–মৌঃ রাশিদ আহমদ গাঙ্গুহী এক প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন–"ইহ্‌রাম ছাড়াও কোন কোন সময় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) খালি মাথায়, খালি পায়ে থাকতেন"। মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী লিখিত কিতাব–মিফ্‌তাহুল জান্নাতে

লিখা আছে "নিজেকে পাপী, গুনাহ্গার, হাকির মনে করে খালি মাথায় নামাজ পড়লে নামাজ মাকরূহ হবে না"। বৃষ্টির জন্য ইস্তিসকার নামাজ পড়তে হলেও খালি মাথায় খালি পায়ে ছেঁড়া কাপড় পরিহিত অবস্থায় উম্মুক্ত প্রান্তরে গিয়ে নামাজ পড়তে হয়। এ ভাবেই তা লেখা আছে। হজ্বে ইহরাম অবস্থায় খালি মাথায় নামাজ পড়তে হয়। অতএব ইমাম হোসাইন ও তাঁর পরিবারের বেপানা ও নেস্তি অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে তাদের মহব্বতে বিগলিত হয়ে মহররমের দশটি দিন আহলে বাইতের পাগলগণ খালি পায়ে ও খালি মাথায় থাকলে, মাটিতে শুলে, তৈল সাবান না মাখলে নেস্তিভাবে চললে অজ্ঞানতার পরিচয় হয় কি?

উম্মে ফজল বিনতে হারিস থেকে বর্ণিত, ইমাম হোসাইন ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মহানবী (সাঃ)-এর কোলে দেয়া হয়েছিল। তখন জিব্রাইল (আঃ) সেখানে উপস্থিত হয়ে নবীজীকে বললেন-আপনার উম্মতগণ আপনার এ নাতিকে শহীদ করবে। তিনি নবীজীকে কারবালার লাল রংয়ের মাটি দেখালেন। এ কথা শুনে ও মাটি দেখে নবীজী কাঁদতে শুরু করলেন। (দ্রঃ মেশ্কাত)

উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, একদা মহানবী (সাঃ) আমার ঘরে ছিলেন। এমন সময় ইমাম হোসাইন হঠাৎ এসে তাঁর বুকে চরে খেলা করতে লাগলো। আমি চেয়ে দেখি হুজুর (সাঃ) হাতে মাটি নিয়ে কাঁদছেন। আরজ করলাম, হযরত আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমার এ নাতী শহীদ হবে। (এটা কারবালার মাটি (দ্রঃ হযরত আবদুল কাদের জিলানী লিখিত)

উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালামা বর্ণনা করেছেনঃ

একদিন মহানবী (সাঃ) বিশ্রাম করার পর বিছানা ছেড়ে উঠলেন এমন সময় তাঁর হাতে লাল রংয়ের মাটি ছিল। তিনি তা নড়াচড়া করে দেখছিলেন। আমি হযরত (সাঃ)কে জিজ্ঞেস করলাম, এ মাটি কি? তিনি বললেন, মহানবী (সাঃ) হাতে কারবালার মাটি নিয়ে কাঁদা-এটাই ইঙ্গিত করে যে, প্রিয় ব্যক্তির কোন নিশানা সম্মুখে থাকলে তার প্রতি প্রেমের জোয়ার সহজেই বহে, হোসাইন ইরাকের মাটিতে শহীদ হবে। জিব্রাইল (আঃ) এইমাত্র এসে আমাকে একথা জানালেন। এ মাটি সে স্থানেরই মাটি। মহানবী (সাঃ) সে মাটির গন্ধ নিলেন এবং বললেন, এ মাটি থেকে বিপদ-আপদের গন্ধ আসছে। তারপর সে মাটি তিনি আমার হাতে দিয়ে বললেন এ মাটি যখন রক্ত হয়ে যাবে তখন বুঝে নেবে হোসাইন শহীদ হয়েছে। আমি ঐ মাটি শিশিতে ভরে রাখলাম। যেদিন ইমাম হোসাইন শহীদ হলেন সেদিন এ মাটি রক্তে পরিণত হয়েছিল। (দ্রঃ ছাওয়ায়েকে মুহারেকা)

সিফ্ফীনের দিকে যাওয়ার সময় হযরত আলী (রাঃ) ফোরাত নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে বললেনঃ এ জায়গার নাম কি? লোকেরা বলল, "কারবালা।" একথা শুনে তিনি এমনভাবে কাঁদতে লাগলেন যে, তার চোখের পানিতে কারবালার মাটি ভিজে

গেল। তারপর তিনি বললেনঃ একদা মহানবীর (সাঃ) কাছে গিয়ে দেখি তিনি কাঁদছেন। আমি আরজ করলাম, হযরত, আপনি কাঁদছেন কেন? হযরত (সাঃ) বললেন, জিব্রাইল (আঃ) এইমাত্র এসে খবর দিলেন হোসাইনকে ফোরাতের কিনারে শহীদ করা হবে সে স্থানটির নাম কারবালা। সে স্থানের মাটির গন্ধ নিতে বললেন, সে মাটির গন্ধ নিতেই আমার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল।

গারায়েব গ্রন্থে সুদৃঢ় প্রমাণের সাথে বর্ণিত আছেঃ হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদতের সংবাদ হযরত জিব্রাইল (আঃ) মহানবীকে (সাঃ) ক্রমান্বয়ে পাঁচবার দিয়েছিলেন। প্রথম ইমাম হোসাইন যেদিন ভূমিষ্ঠ হন সেদিন, দ্বিতীয় বার তাঁর বয়স যখন চার মাস, ৩য় বার তাঁর বয়স যখন তিন বৎসর, ৪র্থ বার তার বয়স যখন চার বৎসর এবং পঞ্চম বার তিনি যখন পাঁচ বছরে পদার্পণ করেন।

প্রামাণ্য গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছে যে, হযরত জিব্রাইল (আঃ) হযরত আদম (আঃ)-কেও ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর শাহাদতের সংবাদ প্রদান করেছিলেন (পাঞ্জতনের জীবনী)।

যখন ইমাম হোসাইন (রাঃ) কারবালায় পৌঁছলেন, তখন তিনি তাঁর নিজ ভগ্নি কুলসুমকে বললেন, হে ভগ্নি! একদা আমি আমার মহামান্য পিতা হযরত আলী (রাঃ)-র সঙ্গে সফরে ছিলাম, তিনি সফর হতে ফেরার পথে এ স্থানে এসে বিশ্রাম করেন এবং আমার ভাই হাসানের উরুর উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়েন। তখন আমি পিতার ছিরহানে ছিলাম। হঠাৎ তিনি জাগ্রত হয়ে রোদন করতে করতে উঠে বসলেন। আমার ভাই হাসান তাঁর রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, স্বপ্নে দেখলাম এ স্থান রক্তসমুদ্রে পরিণত হয়েছে এবং আমার পুত্র হোসাইন সেই রক্তসমুদ্রে সাঁতার কাটছে আর সাহায্য প্রার্থনা করছে। কিন্তু! তাঁর সাহায্যার্থে কেউ এগিয়ে আসছে না। সে আশ্রয় চাচ্ছে-কেউ তাকে আশ্রয় দিচ্ছে না। অতঃপর পিতা আমার দিকে লক্ষ্য করে বললেন, তখন তুমি কি করবে? অবনত মস্তকে আমি বললাম, হে মহামানব্য পিতা! আমি মহান আল্লাহ্র মহিমার উপর ধৈর্য ধারণ করব। ইনশাআল্লাহ্! আমি ধৈর্যের সাথেই রক্তসমুদ্রে হৃষ্ট চিত্তে সাঁতার কেটে যাব। এতে বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হবে না। (পাঞ্জতনের জীবনী)

জনাব হোসেন কাসেফী (রঃ) স্বীয় কিতাব "রওজাতুস্ শোহাদায়ে" লিখেছেন যার সারমর্ম হলঃ হযরত ইমাম হোসাইন যখন জন্মগ্রহণ করেন ঐ সময় মহান আল্লাহ জিব্রাইল (আঃ) কে মহানবী (সাঃ)-এর কাছে পাঠালেন। তুমি আমার হাবিবকে হোসাইনের জন্মোপলক্ষে মোবারকবাদ জ্ঞাপন কর এবং একই সাথে তার শাহাদতের সংবাদ দিয়ে শোক প্রকাশ কর। এ সময় মহানবী (সাঃ) ইমাম হোসাইনকে কোলে নিয়ে তাঁর গলায় চুম্বন দিচ্ছিলেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) এসে তাঁকে মোবারকবাদ দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শোকও প্রকাশ করতে লাগলেন। মহানবী (সাঃ)

বলেন–মোবারকবাদের কারণ বুঝতে পারলাম, কিন্তু শোক প্রকাশের অর্থ কি? জিব্রাইল (আঃ) বললেন, আপনার প্রিয় নাতির গলদেশে যে স্থানে আপনি চুম্বন দিচ্ছেন, তাঁর পিতা–মাতা ও ভ্রাতার পরলোক গমনের পর তাঁর গলায় সে স্থানে খঞ্জর চালানো হবে। তারপর জিব্রাইল (আঃ) কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনার কিছু বর্ণনা দিলেন। মহানবী (সাঃ) ঐ শোকাবহ ঘটনা শুনে খুব ক্রন্দন করলেন। হযরত আলী (রাঃ) ঐ সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু রাসূলে খোদা ও জিব্রাইল (আঃ)–এর কথাবার্তা শুনতে পাননি। মহানবী (সাঃ)–কে কাঁদতে দেখে অস্থিরচিত্তে তিনি আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কাঁদছেন কেন? মহানবী (সাঃ) কে জিব্রাইল (আঃ) যা কিছু বলেছিলেন, তা তিনি সবই হযরত আলীকে জানালেন। এ মর্মান্তিক ঘটনা শুনে কাঁদতে কাঁদতে তিনি হযরত ফাতেমা (রাঃ)–এর নিকট গেলেন। অবাক হয়ে হযরত ফাতেমা বললেন, আপনি কাঁদছেন কেন? আজ আমাদের আনন্দের দিন। যেহেতু মহান আল্লাহ আমাদেরকে মোবারক পুত্র সন্তান দিয়েছেন। তখন হযরত আলী (রাঃ) বললেন, তুমি তোমার মহামান্য পিতার নিকটে যাও। নবীর পথভ্রষ্ট উম্মত আমাদের এ প্রাণপ্রিয় ছেলের গলা কেটে শহীদ করবে। একথা শোনা মাত্র তিনি কাঁদতে কাঁদতে মহানবীর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং বলতে লাগলেন, আমার এ মাসুম বাচ্চা কি দোষ করল যে, আপনার উম্মতগণ তাকে মেরে ফেলবে।

রাসূলে খোদা (সাঃ) বললেন, এ দুর্ঘটনা এখন সংঘটিত হবে না। যখন আমি, তুমি, আলী এবং হাসান কেউ থাকবে না তখনই তা সংঘঠিত হবে। হযরত ফাতেমা (রাঃ) কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন হায়রে হোসাইন! তখন কে তোমাকে সাহায্য করবে এবং কেই বা তোমার জন্য শোক প্রকাশ করবে? তোর অনাথিনী মা যদি তখন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারতো তাহলে হয়ত দুফোঁটা চোখের পানি ফেলে তোর জন্য শোক প্রকাশ করতে পারতো। সে সময় গায়েব হতে আওয়াজ আসলো, হে ফাতেমা তুমি চিন্তা করো না! তোমার মজলুম পুত্রের জন্যে দুনিয়ার লোকেরাই শোক প্রকাশ করবে এবং তোমার পিতার প্রেমিক উম্মতগণ কিয়ামত পর্যন্ত হোসাইনের অসহায়ত্বের কথা স্মরণ করে ক্রন্দন করবে। উল্লিখিত হাদিসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম হোসাইনের শাহাদতের কাহিনী বর্ণনা করা জিব্রাইল (আঃ)–এর সুন্নাত এবং শাহাদতের বর্ণনা শুনে ক্রন্দন করা মহানবী ও তার আহলে বাইতের সুন্নাত।

ইমাম হোসাইনের শাহাদতের বর্ণনা শ্রবণ করা এবং বর্ণনা শুনে ক্রন্দন করলে উক্ত সুন্নতদ্বয় আদায় হয়ে যায় এবং উভয় সুন্নতই দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত থেকে যায়। ইমাম হোসাইনের জন্য ক্রন্দন করলে তা মহানবী (সাঃ)–এর ক্রন্দনের সাথেও সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "মান তাশাবাহা বিকাত মিন ফাহুয়া মিনহুম" অর্থাৎ যে যার সংগে সাদৃশ্য মুশাবেহাত রাখে সে তার অন্তর্ভুক্ত হবে।

মহানবী (সাঃ) আরও বলেছেন, "মান আহাব্বা শাইয়ান ফা আকছারা জিকরাহু।"

অর্থাৎ যে যাকে ভালোবাসে–তার আলোচনাই সে অধিক করে থাকে। ইমাম হোসাইন (রাঃ)কে তথা আহলে–বাইতকে যে ভালোবাসে তাদের আলোচনা বা প্রশংসা গীতি কথার মাধ্যমেই হোক কিংবা বর্ণনায় মাধ্যমেই হোক কিংবা সংগীত বা মর্সিয়ার মাধ্যমেই হোক তা করতে বা শুনতে তার ভালো লাগবে। তার বিরুদ্ধাচরণ করতে কিছুতেই মন চাইবে না। কেউ মন্দ বললে তার প্রতি ক্রোধের উদ্রেক হবে। আহলে বাইতের বর্ণনা যে স্থানে যেভাবেই হোক না কেন, সে স্থানকে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা উত্তম বলে মনে করবে। তবে এর পবিত্রতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

হাদিসে বর্ণিত আছে, যে স্থানে আল্লাহ্‌র ওয়ালীদের আলোচনা হয় সে স্থানে আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয়। আহলে বাইততো আল্লাহ্‌র ওয়ালীদের সরদার। তাঁদের আলোচনায় আল্লাহ্‌র রহমত অবতীর্ণ হবে না কেন? মাসিক মদীনা পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা মহীউদ্দিন সমকালীন প্রশ্নের জবাবের কলামে লিখেছেন, "যে সংগীত মানুষের মধ্যে মহৎ প্রেরণার সৃষ্টি করে, সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে বা আধ্যাত্মিকতার দিকে অনুপ্রাণিত করে সে প্রকার সংগীত মোটেই দূষণীয় নয়।" হযরত আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ) "মাদারেজুন্নুবুওয়াত" গ্রন্থে লিখেছেন–তাজকেরার লেখক বর্ণনা করেছেন লোকজন হযরত আবু হানিফা (রাঃ) ও সুফীয়ান সওরীকে (র)–কে সংগীত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তার জবাবে বললেন, সংগীত ছগীরা গুনাহও নয়, কবীরা গুনাহও নয়। (এর উর্দু তরজমা ৭৮৮ পৃঃ দ্রঃ) ইমাম গাজ্জালীর–গ্রন্থ এহইয়াউল উলুম–এর উর্দু তর্জমা মাহাফুল আরাফীনে আছে–সুর প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের খোরাক। ফতুয়ায়ে রাশিদিয়া ৪৭৭ পৃঃ (কৃত মৌঃ রাশিদ আহমদ গাংগুহী)। লেখা আছে "মেয়েদের জমাতে মেয়েরা গান গাওয়া দুরস্ত আছে যদি ফেৎনার আশংকা না থাকে। নতুবা জায়েজ নয়।" সুতরাং ইমাম হোসাইনের শাহাদতের বর্ণনা সংগীতের মাধ্যমে গাহিলে মোটেই দোষণীয় নয়।

হযরত সৈয়দ আলী হামদানী (রঃ) "মাওয়াদ্দাতুল 'কুর্‌বা' গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, কিয়ামত যখন সংঘটিত হবে আরশের প্রান্ত হতে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন, "হে হাশরের লোকজন। তোমরা চোখ বন্ধ কর। হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এবং তার কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এ ময়দান অতিক্রম করবেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ)–এর নিকট থাকবে হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদত বরণের রক্তরঞ্জিত জামা। তিনি আরশের স্তম্ভের নীচে এসে বলবেন, মহান আল্লাহ, তুমি ন্যায় বিচারক, তুমি আমার ও আমার সন্তানের হত্যাকারীর সম্পর্কে সমুচিত ফায়সালা কর। মহানবী (সাঃ) শপথ করে বলবেন, মহান আল্লাহ আমার ফাতেমার ইচ্ছানুযায়ী ফায়সালা করবেন। তারপর হযরত ফাতেমা আরজ করবেন, হে প্রভু, আমার হোসাইনের মুসিবতের কথা স্মরণ করে যারা কেঁদেছে তাদের জন্য আমার শাফায়াত কবুল করুন। মহান আল্লাহ হযরত

ফাতেমার শাফায়াত কবুল করবেন।

ইমাম হোসাইন রক্তাপ্লুত চেহারা নিয়ে কিয়ামতের ময়দানে হাজির হবেন ও বলবেন, হে আল্লাহ্ তার জন্য আমার শাফায়াত কবুল করুন যে ব্যক্তি আমার মুসিবতের জন্য কান্নাকাটি করেছে। (রওজাতুশ্ শোহাদা)

আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, নেছায়ী বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সাঃ) একদিন মিম্বারে বসে খোত্বা দিচ্ছিলেন, ঠিক এমন সময় ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসাইন (আঃ) সেখানে আসলেন, তখন তাঁদের বয়স খুব কম ছিল। পড়ে গিয়ে ব্যথা পাবে মনে করে মহানবী (সাঃ) বক্তৃতা দেয়া বন্ধ করে তাঁদেরকে তুলে কোলে নিলেন। খোতবা দেয়া ওয়াজিব, তাও তিনি ত্যাগ করা পছন্দ করলেন, কিন্তু ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (আঃ) ব্যথা পেতে পারেন এটা তিনি সহ্য করতে পারেননি। কারবালার ঐ মর্মান্তিক ঘটনা মহানবীর (সাঃ) প্রাণে কী পরিমাণ আঘাত হানতে পারে তা চিন্তা করে অনুভব করুন।

বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে, মহানবী (সাঃ) একদিন নামাজে সেজদায় গেলেন, ইমাম হোসাইন (রাঃ) এসে তাঁর পিঠে সাওয়ার হয়ে বসেন। সেজদা হতে মাথা ওঠালে তিনি পড়ে যাবেন মনে করে মহানবী (সাঃ) সিজদা থেকে মাথা ওঠালেন না। হোসাইন (রাঃ) যখন স্বেচ্ছায় মহানবীর (সাঃ) পবিত্র পিঠ থেকে নামলেন তখন মহানবী (সাঃ) মাথা ওঠালেন। হায়! ইমাম হোসাইনের প্রতি মহানবী (সাঃ)-এর কী অপরিসীম ভালবাসা!

হযরত আব্দুল কাদির জ্বিলানী (রহঃ)-এর কিতাব "গুনিয়াতুত তালিবীন"-এর উর্দু অনুবাদের ৪৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, ইমাম হোসাইন-এর পবিত্র মাজারে সত্তর হাজার ফেরেশতা নাজিল হয়। তারা কিয়ামত পর্যন্ত ইমাম হোসাইনের শাহাদতের মুসিবতের জন্য কান্নাকাটি করতে থাকবে। জল-স্থল অন্তরীক্ষে, কীট-পতঙ্গ, গাছপালা, পাথর, জ্বীন, ফেরেশতা, মহান নবী ও ওয়ালীগণ ইমাম হোসাইন (রাঃ) মুসিবতে ক্রন্দন করেছে যা ছিররুশ শাহাদাতাইন, তাফরিরুস্ শাহাদাতাইন, প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। উপমহাদেশের বিশিষ্ট লেখক মৌঃ মুফতী মোহাম্মদ শফী "শহীদে কারবালা" গ্রন্থে লিখেছেন, আহলে বাইতের অর্থাৎ মহানবী (সাঃ) পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির প্রতি ভালোবাসা রাখা বা সম্মান প্রদর্শন করা ঈমানের অঙ্গ। তাঁদের উপর পৈশাচিক ও নির্দয় অত্যাচারের কাহিনী কখনো ভোলা যায় না। নির্যাতিত হযরত হোসাইন (রাঃ) ও তাঁর সাথীদের মর্মান্তিক ঘটনা যার অন্তরে দুঃখ, বেদনা ও সহানুভূতির উদ্রেক না করে সে মুসলমান তো দূরের কথা, মানুষও হতে পারে না।" কোন ঘটনাই কারবালার ঘটনার মত এমন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। এতে মহান আল্লাহ্র বিশেষ মহিমা ও শক্তি নিহিত রয়েছে। সেজন্য এ ঘটনার গুরুত্ব এত বেশী।

কোন প্রকার পার্থিব সুখ সম্ভোগের নিমিত্তে নিষ্পাপ শিশুগণসহ ইমাম হোসাইন (রাঃ) কারবালায় শাহাদত বরণ করেননি। মুনাফিক ইয়াজিদের বিশাল বাহিনীর সঙ্গে খেলাফতের মোহে জেহাদ করেননি। তাঁর প্রিয় নানা মহানবী (সাঃ) প্রচারিত ইসলামকে বিশ্ববাসীর কাছে সমাদৃত ও উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মহান ব্রত নিয়ে কারবালায় তিনি আত্মদান করেছেন। কারবালার ঘটনাবলী মূলত অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম, অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের সংগ্রাম। কারবালার ঘটনাবলী ও এর চিহ্নসমূহ জাগ্রত থাকলে বিপুল উপদেশ গ্রহণের সুযোগ পাওয়া যায়। উক্ত ঘটনাবলীর দ্বারা হক ও বাতিল ধরা পড়ে। কে নবী প্রেমিক, কে নবীপ্রেমিক নয় এবং কিভাবে নবীপ্রেম ও নবী-পরিবারের প্রেম রক্ষা করা যায় তা দিবালোকের মত ভাস্বর হয়ে ফুটে ওঠে। নবী এবং নবী পরিবারের প্রেম ভালোবাসা ব্যতীত নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দাড়ি, পাগড়ী, টুপী ইত্যাদি সবই যে কোন কাজে আসবে না তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। কারবালার ঘটনাবলী দ্বারাই আল্লাহ নবী পরিবারের বিদ্বেষীদের অন্তরের লুক্কায়িত বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দিয়েছেন। কারবালার ঘটনাসমূহ সংঘটিত না হলে নবী ও নবী পরিবারের শত্রু পরিচিতি নির্ণয় খুবই কঠিন হয়ে যেত। কারবালার ঘটনাবলীর দ্বারাই হোসাইনী মুসলমান ও ইয়াজিদি মুসলমানের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়।

হযরত খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী (রঃ) যেমন বলেছেন, "ইমাম হোসাইন (রাঃ) আসল ও নকলের পরিচয় পরিষ্কার দেখিয়ে গেলেন।" ইয়াযিদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ইমাম হোসাইন (রাঃ) কখনও কারবালায় যাননি। যদি সত্যিকারভাবে যুদ্ধ করার জন্যই তিনি কারবালায় গমন করতেন, তাহলে শিশু ও বিবিগণকে নিয়ে অবশ্যই কারবালায় যেতেন না। আসল-নকল মুসলমানের সঠিক পরিচিতি তুলে ধরার জন্য তাঁর কারবালায় আগমন। ইমাম হোসাইনের শেষ বাক্যটি কত তাৎপর্যপূর্ণ! ইয়াযিদের সেনাবাহিনীতে সবই ছিল মুসলমান। অথচ ইমাম তাদের বলছিলেন, তোমাদের মধ্যে কি একজনও মুসলমান নেই? তোমাদের মধ্যে কি একজনও সত্যিকার মুসলমান নেই? অর্থাৎ তোমরা সবাই মুসলমান কিন্তু তোমরা নকল মুসলমান। হযরত ইমাম হোসাইন-এর এ বাক্যটিই সমগ্র মানব জাতিকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে সকল অন্যায় ও মিথ্যার বিরুদ্ধে জেহাদ করা প্রত্যেক ঈমানদার মুসলমানেরই একান্ত কর্তব্য। এ পরম সত্য কথাটি উপলব্ধি করার জন্যই ইমাম হোসাইনের শাহাদত। আহলে বাইতের প্রেমিকগণ ইমাম হোসাইনের স্মরণে কারবালার স্মৃতি ও বৈশিষ্ট্য রক্ষার বাসনায় এবং মানব মনে তা চিরজাগরূক রাখার মানসে আনুষ্ঠানিকভাবে পবিত্র মহররম পালন করে থাকে। এতে আহলে বাইতের প্রেমিকগণকে শিয়া বলে অভিহিত করা ঈর্ষার পরিচায়ক। কেননা শিয়া নামের পরিচয় আকিদা-বিশ্বাসে। আর শিয়ারাও মুসলিম এবং একটি স্বীকৃত মাযহাবের অনুসারী। তাদেরকে কাফের-মুশরিক বলা

যায় না। পবিত্র মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ এবং হজব্রত পালন তাদের জন্য নিষিদ্ধ নয়। বিনা বাধায় নির্দ্বিধায় তারা হজ্জ ও ওমরাহ পালন করে যাচ্ছে। অথচ হারাম শরীফের এলাকার মধ্যে কাফের-মুশরিকদের প্রবেশ নিষেধ। সুতরাং শিয়ারা যদি কাফেরই হত আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোন মুসলমান আলেম এ ব্যাপারে আপত্তি উথাপন করেননি। এমন কি সৌদী আরবের কোন আলেম বা মুফতী শিয়াদেরকে হজ্জ ও ওমরাহ পালনে কোন প্রকার বাধা দিচ্ছেন না। শিয়াগণ ইসলামের মৌলিক বিষয়ে অন্য সব মাজহাবের সঙ্গে একমত। তারা ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর উস্তাদ হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ)-এর ফেকাহ্ অনুযায়ী চলেন। আর আমরা চলি আবু হানিফা (রহঃ) ফেকাহ মোতাবেক। আবার কেউ কেউ চলেন শাফেয়ী, মালিকী এবং হাম্বলী মাজহাব অনুযায়ী। শিয়াগণ অবশ্যই আহলে বাইতের পাগল। অন্য কোন মাজহাবের লোক যদি আহলে বাইতের পাগল হয় তবে তারা কি শিয়া হয়ে যাবে? এমন অজ্ঞতামূলক ফেরকাই হলো আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ-বৈরিতার ভাব।

"ইরানী শিয়ারা কি কাফের?" এই পুস্তকে মাওলানা ব্যারিষ্টার কোরবান আলী ৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ইরানের শিয়ারা যদি কাফের হত তাহলে এইতো চলতি বছর ১৯৮৮ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারী হতে সৌদী আরবের জেদ্দায় বিশ্ব মুসলিমদের ৪০টি দেশের বিশিষ্ট আলেমদের উপস্থিতিতে ৪র্থ বিশ্ব ফেকাহ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো, সে স্থানে ইরানের পক্ষ থেকে ইরান সরকারের-ইসলামী প্রচারণা বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারী হুজ্জাতুল ইসলাম মোহাম্মদ আলী তাস্খিরি অন্যতম মেহমান হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সম্মেলনে যোগদানকারী ফকিহগণ ইসলামী মাজহাবসমূহের মধ্যে সর্বমোট ৮টি মাজহাব, যথাঃ হানাফী, শাফেয়ী, মালিকি, হাম্বলী, ইশনা আশারী, যায়েদী, ইবাদী ও জাহেরী এই কয়টিকেই স্বীকৃত মাজহাব বলে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ইরানী শিয়াদের সবই ইশনা আশারী মাজহাবের অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় খোদ সৌদী আরবে বিশ্ব ফিকাহ সম্মেলনে ইরানীদের মাজহাবকে স্বীকৃত মাযহাব বলে গণ্য করা হয়েছে।

মিশরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের সর্বত্র পরিচিত। আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শেখ শালতুত ইরানের আয়াতুল্লাহ বুরুজার্দির সাথে মিলিত হয়ে যৌথভাবে মিশরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন "দারুত তাক্‌রিব বায়নাল্ মাযাহিবিল্ ইসলামিয়া" অর্থাৎ ইসলামী মাজহাবসমূহকে ঘনিষ্ঠতরকরণ সংস্থা। শেখ শালতুত সুন্নী জগতের একজন বিশ্ব বিখ্যাত আলেম ছিলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, ইশনা আশারি মাজহাব (বর্তমানে ইরানে যা চালু আছে) হানাফী শাফেয়ী এবং অন্যান্য সুন্নী মাজহাবের মতই একটি স্বীকৃত মাজহাব।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর বিশিষ্ট খলিফা মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর ইরান, ইরাক ও সৌদী আরব সফরকালে যা প্রত্যক্ষ করে এলেন সে অভিজ্ঞতা তিনি বই আকারে প্রকাশ করেছেন। উক্ত পুস্তকের ৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, "জাফরী ফিকাহ অনুসারী ইরানের ক্ষমতাসীন শিয়ারা কাফেরও নয়, বেদাতীও নয়। তারা শিয়া মাজহাবী মুসলমান। তাদের সাথে আমাদের যে মত-পার্থক্য রয়েছে তা কোরআন-হাদীসের ব্যাখ্যাগত পার্থক্য"।

"তাফসীরে কাশ্‌শাফ ও তাফসীরে কাবীরে" ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-র কবিতার একটি পংক্তি উল্লেখ আছে। "ইন্‌কানা রাফ্‌জান বেহুব্বে আলে মুহাম্মাদীন, ফাল ইয়াশ্‌হাদিস্ সাক্বালাইন-ইন্নি রাফেজী।" অর্থ মহানবীর (সাঃ) বংশধরদের প্রতি মহব্বত রাখলে, মানুষ যদি রাফিজী শিয়া হয়ে যায়-তাহলে জ্বিন ইনসান সাক্ষী থেকো আমিও রাফিজী (শিয়া)। অর্থাৎ আমি মহানবীর বংশধরদেরকে অত্যধিক মহব্বত করি, এতে তোমরা আমাকে রাফিজি-শিয়া বা অন্য যা কিছুই বল না কেন আমি মহানবীর বংশধরদের মহব্বত ছাড়তে পারবো না। হযরত কাজী হামিদ উদ্দীন নাগুরী (রহঃ) বলেছেন ঃ 'আলীরা মহব্বত দারাম খালক গুইয়াদ রাফেজী, পাছখোদা ওয়া রাসুল ওয়া জিব্রাইল বশান্দ রাফিজী'। অর্থ ঃ আমি হযরত মাওলা আলীকে ভালোবাসি বলে লোকেরা আমাকে রাফিজী (শিয়া) বলে দোষারোপ করে। তাহলে খোদা ও রাসূলে খোদা (সাঃ) ও জিব্রাইল (আঃ)-ও রাফিজী (শিয়া)। অর্থাৎ আমি যেমন হযরত আলীকে ভালোবাসি আমা হতে শত গুণে বেশী ভালোবাসেন খোদা ও তাঁর রাসূল (দঃ) ও ফেরেশতা হযরত জিব্রাইল (আঃ)। তাহলে তাঁরা বড় শিয়া। হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দেছে দেহলভী (রহঃ)-এর রচিত গ্রন্থ "আখবারুল আখিয়ার"-এ লিখেছেন হযরত শায়খ আহমদ মাজ্‌দ শিবানী (রহঃ) আপন পীর মুরশেদের দস্তুর মাফিক মহরমের দশ তারিখ ও রবিউল আওয়ালের বার তারিখে নতুন কাপড় ও ধৌত কাপড় পরিধান করতেন না। আর ঐ রাতগুলোতে তিনি মাটিতেও শুতেন। মহররমের দশ তারিখে তিনি এমন কান্নাকাটি করতেন মনে হতো যেন কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাবলী তাঁর চোখের সামনে ভাসছে। (আখবারুল আখইয়ার উর্দু তরজমা ৩২৮ পৃঃ দ্রঃ)।

হযরত আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী (রহঃ) রচিত গ্রন্থ 'মাদারেজুন্নুবুয়ত' উর্দু তর্জমা ২য় খণ্ডের ৬৭৯ পৃঃ লিপিবদ্ধ আছে "মোমিন আলীকে ভালোবাসে আর মুনাফীকরা তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে"। (হাদিস) অর্থাৎ হযরত আলীকে যে ভালোবাসে সে মোমেন, আর যারা হযরত আলীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তারা মুনাফিক। হযরত শেখ সাদী (রহঃ) বলেছেন, "আগার দাওয়াতাম রাদকুনি ওয়ার

কাবুল মান্ ওদাস্তো দামনে আলে রাসুল" অর্থ ঃ হে খোদা! তুমি আমার আর্জি রক্ষা কর বা না কর আমি কিন্তু আওলাদে রাসূলের দামান ধরে রেখেছি। আওলাদে রাসূলের মহব্বত অন্তরে থাকলে মহান আল্লাহ তাকে দোযখে পাঠাবেন না। আহলে বাইত সম্পর্কে সত্য উপলব্ধি করতে না পারলে তাঁদের প্রতি ভালোবাসা জন্মাতে পারে না এবং তাঁদের প্রতি ভালোবাসা না জন্মালে নাজাত পাওয়া যাবে না। হাদিস কোরআনের দ্বারাই তা প্রমাণিত। তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করলে ও তাঁদের মহব্বতের পরিচিতি প্রদর্শন করলে যদি শিয়া হতে হয় তাহলে ইয়াজিদী ও খারিজী মুসলমান ছাড়া সবাই শিয়া। আমরা, পাক পাঞ্জতনের প্রেমিকগণকে যত প্রকার দোষারোপই করুক না কেন, আমরা আহলে বাইতের প্রতি প্রেম-ভক্তি-ভালোবাসা ছাড়তে পারবো না। আহলে বাইতের গোলামীই আমাদের কাম্য। আমরা পাপী। পাপীদের নাজাতের জন্যে সুপারিশ করবেন পাক পাঞ্জতন। পাপ ছাড়া কে আছে! যত বাহাদুরই হোক পাক পাঞ্চতনের নজরে করমের প্রয়োজন আছে। আর যাদের সুপারিশের প্রয়োজন নেই তারা আহলে বাইতকে আমাদের মতই দোষে-গুণে মানুষ মনে করে এবং আমাদের বড় ভাই বড় বোন বলে আখ্যায়িত করতে দোষণীয় বলে মনে করে না। তাহলে তারা বড় বড় অলি-আওলিয়া হতেও নিজদেরকে বড় মনে করে। কারণ বড় বড় অলি-আওলিয়াও আহলে বাইতের দয়া-মায়া ও শাফায়াতের মুখাপেক্ষী। "নাহজুল হেদায়ার" বাংলা তর্জমায় ১৭২ পৃঃ লেখা আছে, "হযরত আলী ও আহলে বাইতের প্রতি অত্যন্ত মহব্বত রাখেন বলে যারা আহলে সুন্নতভুক্ত বড় বড় ওলী, আলীম ও বিশেষ বিজ্ঞ লোকজনকে রাফিজী-শিয়া বলে বিদ্রুপ করে তারাই মূর্খ ও জালিম।"

উপরোক্ত পুস্তকের ১৭১ পৃঃ লিখা আছে আহলে বাইতের মহব্বত এবং তাঁদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা রাখা আহলে-সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঈমান ও ইসলামের মূল চাবিকাঠি। তাঁদের প্রতি মহব্বত রাখা নূহ (আঃ)-র কিস্তি বা তরী আরোহণের সমতুল্য। যে তরীতে আরোহণ করেছে সে নাজাত পেয়ে যাবে, আর যারা তরীতে আরোহণ করেনি তারা নূহ (আঃ)-র ছেলের মত অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে।

হযরত খাজা মঈনউদ্দীন চিশ্‌তী (রহঃ) বলেছেন ঃ

"জানে মান্ আবাদ বেনামে হোসাইন,
মান বে গোলামানে গোলাম হোসাইন।"

অর্থাৎ

"আমি আমাকে হোসাইনের পদপ্রান্তে সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়েছি।
আমি কেবলই গোলাম কেবল তাঁরই গোলাম যিনি হোসাইনের গোলাম।"

উক্ত খাজা সাহেব আরও বলেনঃ

"শাহ আস্ত হোসাইন, পাদশাহ আস্ত হোসাইন,
দীন আস্ত হোসাইন, দীন পানাহ্ আস্ত হোসাইন।
সারদদ্ নাদদ্ দাস্ত দার্ দাস্তে ইয়াজিদ
হাক্কাকে বেনায়ে লা ইলাহ আস্ত হোসাইন।"

অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জগতের সম্রাট হলেন হোসাইন। জগতের ন্যায়বিচারক বাদশাহ হলেন হোসাইন। ধর্ম হলেন হোসাইন, ধর্মের আশ্রয়দাতা হলেন হোসাইন, শির দিলেন, কিন্তু ইয়াজিদের হাতে হাত দিলেন না (মানে কুখ্যাত মদ্যপায়ী, লম্পট, খুনী ইয়াজিদকে আমিরুল মোমেনীন বলে স্বীকার করেননি)। সত্য কলেমা লা-ইলাহার স্তম্ভ হলেন হোসাইন। প্রতি বৎসর আশুরার সময় পাক পাঞ্জতন প্রেমিকগণ কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাবলীকে দুঃখভারাক্রান্ত অন্তরে স্মরণ করে শোক-দুঃখ-বেদনা প্রকাশ করে কান্নাকাটি করে থাকেন, যেমন মহানবী (সাঃ) কারবালার মাটি নিয়ে ইমাম হোসাইনের শোক দুঃখে অধীর হয়ে কেঁদেছিলেন। মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের অধিক শোক করা জায়েয নয়। কিন্তু জিন্দা লোকের জন্য তাদের দুঃখে-কষ্টে অনুশোচনা করার হদ বা সীমা শরীয়ত নির্ধারণ করেননি। মহান আল্লাহ শহীদগণকে জিন্দা বলে ঘোষণা করেছেন। তাই তাঁদের দুঃখে-কষ্টে শোক প্রকাশ করার কোন সীমা নেই। সুতরাং ইমাম হোসাইন (রাঃ) যখন শহীদদের নেতা তখন তাঁর জন্য আজীবন শোক করতে কোন বাধা ও আপত্তি থাকতে পারে না। তাঁদের শোকে বিভোর হয়ে "হায়-আফসোসে"র সংগে বুকে বা মাথায় হাত রাখা কিংবা হাত মারা মহানবীর (সাঃ) অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে না।

হযরত হাজী এমদাদুল্লা মোহাজেরে মাক্কী (রহঃ) কী চমৎকার লিখেছেন ঃ

"কুল্লু দামিন দামুন ইল্লা দামাশ্‌শাহিদ
কুল্লু যান্‌বিন যানবুন ইল্লা যানবাল আশেক"।

অর্থাৎ প্রত্যেক রক্তই নাপাক, কিন্তু শহীদের রক্ত অপবিত্র নয়। প্রত্যেক পাপই পাপ। কিন্তু আশেকের পাপ পাপ নয়। ফিকাহ্‌শাস্ত্রের দৃষ্টিতে সকল রক্তই নাপাক। আর এ কারণে হায়েয, নিফাস ও ইস্তিহাযার রক্ত ব্যতীত অন্য যে কোন রক্ত যদি বাগালী দিরহাম পরিমাণ শরীর বা পোশাকে লেগে যায় তাতে নামায হবে না। আর হায়েয, নিফাস ও ইস্তিহাযার সামান্য এক ফোঁটা রক্তও শরীর বা পোশাকে লেগে থাকলে নামায হবে না। তাই শহীদের রক্ত পবিত্র এটা রূপক অর্থে।

যে সকল কর্মতৎপরতার স্মৃতিসমূহ পাক পাঞ্জতনের মর্মন্তুদ কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাঁদের প্রতি ভালবাসার উদ্রেক সৃষ্টি করে, অনুপ্রেরণা প্রদান করে এবং প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে উৎসাহিত করে তা কখনও হারাম হতে পারে না।

আশুরার দিবসে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাদি সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু কারবালার ঐ মর্মান্তিক রক্তপাতের হৃদয়বিদারক অমর কাহিনী বিশ্ব মুসলিমের অন্তরে যে ভাবে রেখাপাত করে মহা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বিশ্বের কোন ঐতিহাসিক ঘটনাই তেমন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের সংবাদে স্বয়ং মহানবী (সাঃ) যেরূপ বিচলিত ও ব্যথিত হয়েছিলেন সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে তা নজির বিহীন। মেশ্‌কাত শরীফের শেষ খণ্ডে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও উম্মে সালামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত দু'খানা হাদিস পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম হোসাইনের শাহাদাত বরণের স্থানে, মহানবীর (সাঃ) পবিত্র আত্মা মাটিতে লুটিয়ে কান্নাকাটি করেছে ঐ হাদিসদ্বয়েই তাঁর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পাক ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা মুফ্‌তী আহ্‌মদ ইয়ারখান প্রণীত "শানে হাবিবুর রহমানের" (বাংলা তর্জমা) ৩২৪ পৃঃ একটি কবিতার পংক্তি উল্লেখ আছে। "কাফের হে–ওহ্ যো হোসাইন কা মাত্‌ম নেহি কারতে। অর্থ সে ব্যক্তি কাফের যে হোসাইন (রাঃ) এর শোকে সে মাতম করে না"। মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুরের ইন্তেকালের সময় মহান আল্লাহর মহান দরবারে শেখসাদী (রহঃ)–এর কবিতা পাঠ করে তার আহাজারী ও মোনাজাত পেশ করেন "ইলাহী বাহাক্কে বনি ফাতিমা বারকাউলে ঈমান কুনাম খাতিমা। আগার দাওয়াতাম রাদকনি ওর কাবুল, মান ওদাস্তো দামানে আলে রাসুল"। অর্থঃ হে খোদা! নবীর কন্যা ফাতিমার কলিজার টুকরাদের ওয়াসীলায় কলেমা লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ ... যেন আমার জীবনের শেষ কথা হয়। এ মানাজাত কবুল কর কিংবা না কর সে তোমার মরজি মাওলা! আমি দু'হাতে আকঁড়ে ধরেছি আহলে বাইতের নাজাত রজ্জু। (হাফেজ্জী হুজুরের শেষ ওসিয়ত নামক পুস্তকের ২য় পৃঃ দ্রঃ)

হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান "ইরশাদে রহমানী" গ্রন্থের ৫৪ পৃঃ লিখেছেন ঃ "জো মহররম মেঁ ইমাম হোসাইন কা জিকির করতে হেঁ হাসান–হুসাইন কহতে হেঁ – হযরত হোসাইন (রাঃ) উন্‌ছে খোশ হোতে হেঁ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মহররমে ইমাম হোসাইনের স্মরণে জিকির করে "হাসান হোসাইন" বলে–হোসাইন (রাঃ) তার উপর সন্তুষ্ট থাকেন।

জিকরু আলীয়্যিন ইবাদাতুন, হুব্বু আলীয়িন্ ইবাদাতুন্ অর্থাৎ হযরত আলীর জিকির ও ভালোবাসা ইবাদত (তাফছিরে মাজহারী ৪র্থ খণ্ড)।

সত্যকে জেনে শুনেও দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ অর্থের লোভে কিংবা প্রাণের ভয়ে অথবা স্বার্থসিদ্ধির আশায় মিথ্যাকে গ্রহণ করে। সত্য ত্যাগ করে মিথ্যার আশ্রয় নেয়, মিথ্যাকে স্বীকৃতি জানায় অথচ সত্যের স্বীকৃতি জানানোই প্রকৃত ধর্ম পালন। মানুষ

যখন সত্যকে গ্রহণ করে তখনই তার সামনে উপস্থিত হয় কারবালা।

মুষ্টিমেয় কয়েকজন হকপন্থী ছাড়া বাকী সব ইয়াযিদী পথাবলম্বী হয়ে জীবন যাপন করে। প্রকৃত ধর্মের সন্ধান আমরা কয়জনেইবা করি। ইয়াযিদীদের মত ধর্মের দোহাই দিয়ে অধর্ম করে যাচ্ছি। ইমাম হোসাইন এবং তাঁর ভক্তগণও নামাজ পড়তেন, ইয়াযিদ এবং তার ভক্তগণও নামাজ পড়ত। দু'য়ের নামাজ কি একই ধরনের? কখনও না? ইয়াজিদীদের নামাজ হচ্ছে রাজনীতির নামাজ, হোসাইনীদের নামাজ হচ্ছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নামাজ। যেমন– ইয়াজিদের সেনাপতি উমর ইবনে সা'দ কারবালায় তার সৈন্যদেরকে বলেছিল তোমরা যথাশীঘ্র হোসেনের 'কতলের' কাজ সেরে নাও–যাতে আছরের নামাজ কাজা না হয়। এ ছিলো ইয়াজিদীদের নামাজের নমুনা। প্রত্যেকের জীবনেই কারবালা রয়েছে। ইমাম হোসাইনের পক্ষাবলম্বন করলে যে মৃত্যু হবে সে মৃত্যু মধুর চেয়েও মিষ্ট বলে জ্ঞানীগণ উল্লেখ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন ইমাম হোসাইন মরে গিয়ে পচে গলে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু না, ইমাম হোসাইন কখনো মরেননি, তিনি এখনও জীবিত আছেন, চিরকাল জীবিত থাকবেন। হাদিস শরীফে আছে আল্লাহওয়ালাদের মৃত্যু নেই। তাঁরা জীবিত। ইমাম হোসাইনের স্মৃতিছবি প্রত্যেক নবী প্রেমিকের মনে চিরভাস্বর হয়ে আছে এবং থাকবে। ইমাম হোসাইন তাঁর প্রেমিকগণকে প্রাণাধিক ভালোবাসেন। হাশরের দিন তিনি তাঁর ভক্তদের সুপারিশ করবেন। এর অজস্র প্রমাণ আহলে বাইতের জীবনীতে পাওয়া যায়। তাঁর নামের মহত্বতের উসীলায় মহান আল্লাহ গোনাহ মাফ করে দেবেন। ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রেমের সংগে অলীদের নাম উচ্চারণ ও স্মরণ করলে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হন্ এবং তাকে মঙ্গল ও কল্যাণ দান করেন। কারণ মহান আল্লাহ পবিত্র কোরানে ঘোষণা করেছেন, যারা মহান আল্লাহর (ধর্মের) নিদর্শনাদি সম্মান করবে এটা হবে তাদের অন্তরসমূহের তাক্‌ওয়া। (হজ্জ ঃ ৩২)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ কোরবানীর পশু ও সাফা–মারওয়াহ পাহাড়দ্বয়কে তার নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা দিয়েছেন (বাকারা ঃ ১৫৮, হজ্জ ঃ ৩৬)। সাইয়্যেদুশ শুহাদা হোসাইন (রাঃ) নিঃসন্দেহে ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কোরান বলছেঃ শায়ায়িরুল্লাহসমূহকে অর্থাৎ ধর্মের নিদর্শনাদিকে সম্মান করা অন্তরের পরহেজগারী। তাই তাঁর নাম ও কারবালার ঘটনাবলী স্মরণ করা অন্তরের পরহেজগারী অর্থাৎ পুণ্যের কাজ। হোসাইনের নাম আমাদের ইবাদত, হোসাইনের নাম আমাদের রিয়াজত, আধ্যাত্ম সাধনা। হোসাইনের নাম আমাদের ওয়াযীফা, হোসাইন আমাদের শাহাদাতের শক্তি, হোসাইন আমাদের অন্তরের ধন, হোসাইনের পা–হতে মাথা পর্যন্ত ঈমানের আলো। হোসাইন আর ইসলামের মধ্যে পার্থক্য নেই। হোসাইনই ইসলাম,

ইসলামই হোসাইন। ইসলামের হিফাজতকারীই হোসাইন।

"শানে পাক পাঞ্জতন" পুস্তকে উল্লেখ আছে, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গিবন* লিখেছেন–হে মুসলীম! একবার চেয়ে দেখ তোমাদের কী রত্ন আজ অতীতের অন্ধকারে ডুবে গেল। ইসলাম ধর্ম ও নূরনবীর আদর্শ রক্ষার জন্য মহাত্মা ইমাম হোসাইন দুনিয়ার সমস্ত সুখ শান্তি স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে স্ত্রী–পুত্র কন্যা পরিজন, আত্মীয়–স্বজন সব ত্যাগ করেছেন তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য।

হযরত ইমাম হোসেন (আঃ) পাপাত্মা ইয়াজিদের অন্যায় যুদ্ধে অধর্মরূপ হুতাশনে আত্মজলাঞ্জলী দিলেন। আততায়ী পাপিষ্ঠ ইয়াজিদের লোকজন মুসলমান নামধারী হয়েও তুচ্ছ অর্থলোভে, পদমর্যাদার মোহে, পার্থিব সুখ–সম্ভোগের লোভে ইসলাম ধর্মকে পদদলিত করে অধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রাণাধিক দৌহিত্র ইমাম হোসাইনের পবিত্র রক্তে কারবালা প্রান্তর রঞ্জিত করেছে। সেই মুসলমানদের প্রায়শ্চিত্ত রয়েছে সুদূরে ঐ কুয়াশাপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে। চেয়ে দেখ তোমাদের কোটি কোটি মুসলিমের রক্তে পৃথিবী প্লাবিত হয়েছে তার প্রায়শ্চিত্ত করে।

"তাফরিরুশ্ শাহাদাতাইন" গ্রন্থে বর্ণিত আছে–মহান আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সাঃ) আপনার নাতির শাহাদতের কারণে দু' সত্তর হাজার লোক অর্থাৎ একলক্ষ চল্লিশ হাজার লোক ধ্বংস হবে। ঐতিহাসিকগণের ব্যাখ্যায় এক সত্তর হাজার লোকের মৃত্যু হয় কুফার নেতা সরদার মুখ্তার সাকাফীর সময়ে আর এক সত্তর হাজার লোকের মৃত্যু হয় আব্বাসীয় খিলাফতের আমলে আব্বাসীয় খলিফা সাফ্ফাহর আমলে। কোন নবীকেই মহান আল্লাহ সর্বগুণে গুণান্বিত করেননি। প্রত্যেক নবীকেই পৃথক পৃথক গুণ দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু! আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)–এর শাহাদাতে জাহেরী এবং শাহাদাতে বাতেনী গুণ ব্যতীত মহান নবীদের সব গুণই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। মহান আল্লাহ সেই শাহাদাতে জাহেরী ও শাহাদতে বাতেনীর অশেষ মর্যাদাকল্পে তাঁরই প্রাণাধিক দৌহিত্রদ্বয়ের মাধ্যমে সে গৌরবময় ঐতিহ্যপূর্ণ কর্মতৎপরতা সমাধা করে তাকেই সে গৌরবের ভাগীদার করেছেন। এই মহান আল্লাহর রহস্যময় ভেদ (ছিররুশ্ শাহাদাতাইন লেখক আঃ আজিজ মুহাদ্দিছে দেহলভী দ্রষ্টব্য)। যে ইমাম হোসাইনকে ভালোবাসেন, মহানবী (সাঃ) তাকে সীমাহীত ভালোবাসেন। এ সম্পর্কে পবিত্র পাঞ্জতনের জীবনী গ্রন্থে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। "একদা নবী করিম (সাঃ) মদীনার এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে কয়েকটি ছেলে খেলা

*টীকা ঃ ঐতিহাসিক গিবন খৃষ্টান। তাই তিনি খৃষ্টধর্মের ভ্রষ্ট প্রায়শ্চিত্ববাদ দ্বারা শাহাদাতের লক্ষ্য মুসলিম উম্মাহর পাপের প্রায়শ্চিত্ব বিধান বলে উল্লেখ করেছেন যা সঠিক নয়। কারণ ইমাম হোসাইন (রাঃ) শাহাদত বরণ করেছেন পবিত্র ইসলামকে রক্ষা করার জন্য। সত্য ও মিথ্যার মধ্যে প্রভেদ করার জন্য। সকল যুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চেতনা জাগানোর জন্য।

করছিলো মহানবী (সাঃ) তন্মধ্যে একটি ছেলেকে কোলে নিয়ে তার কপালে চুম্বন দিলেন। জনৈক সাহাবী আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল এ ছেলেটির প্রতি আপনার এত স্নেহ প্রদর্শন করার কারণ কি? তিনি (সাঃ) বললেন, এ ছেলেটিকে আমি একদিন হোসাইনের সংগে খেলা করার সময় দেখেছি, হোসাইনের পায়ের ধূলি সে তার আপন চোখে মেখেছে। তখন থেকেই আমি এ ছেলেটিকে খুব ভালোবাসি। ক্বিয়ামতের দিন আমি তার পিতামাতাসহ তার জন্য সুপারিশ করবো।

পাঠকগণ লক্ষ্য করুন, যে ইমাম হোসাইনকে ভালোবাসে মহানবী (সাঃ) তার প্রতি কত সন্তুষ্ট। এমন কি তার পিতা–মাতার প্রতিও। যারা ইমাম হোসাইনের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেন এবং তাঁর জন্য আহাজারী, শোকানুষ্ঠান, প্রশংসাকীর্তন, মর্সিয়া পাঠ্ ইত্যাদি পালন করে থাকে তাদের উপর কি রাসূলে খোদা (সাঃ) অসন্তুষ্ট থাকতে পারেন? প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বিশেষ প্রয়োজন তারা যেন আহ্লে বাইতের প্রতি মহব্বত রাখেন এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। এমন কি কষ্ট করে চেষ্টা করে হলেও তাদের মহব্বতে কায়েম থাকেন। কারণ তাঁদের প্রতি মহব্বতের উসীলায় উভয় জগতের নিয়ামত অর্জিত হবে এবং পূর্ণাঙ্গ ঈমান অর্জন করার সুযোগ পাবে। যদি ইবাদত–বন্দেগীতে কিছু ত্রুটিও থেকে যায় তবুও তাঁদের মহব্বত হতে মুখ ফিরাবেন না। তাঁদের মহব্বত কখনও বৃথা হবে না।

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে ঃ হযরত আনাস বিন মালেক হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি এবং মহানবী (সাঃ) একদিন মসজিদ হতে বের হয়ে আসার সময় মসজিদের ছায়াবানের নিকট এক ব্যক্তির সংগে দেখা হলো। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! ক্বিয়ামত কবে হবে? জবাবে তিনি বললেন, ক্বিয়ামতের জন্য তুমি কি সামান (পাথেয়) তৈরি করেছো? সে ভয় পেয়ে গেলো। আস্তে আস্তে আরজ করলো, হুজুর (সাঃ)। আমি বেশি করে নামাজ, রোযা, সাদকা–খায়রাত আদায় করতে পারিনি কিন্তু আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। মহানবী (সাঃ) বললেন, "ফা আন্তা মাআ মান আহববাতা" অর্থ– তুমি তাঁরই সঙ্গী হবে যাকে তুমি ভালোবাস।

সহীহ মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর সামনে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! এক ব্যক্তি কওমের প্রতি ভালোবাসা রাখে কিন্তু তার হুকুম মোতাবেক আমল করে না। তখন মহানবী (সাঃ) বললেন, ঐ মানুষ তার সংগী হবে যাকে সে ভালোবাসে। সুতরাং আহলে বাইতের ভালবাসা প্রত্যেক মুসলিম নর–নারীর জীবনের কাম্য হওয়া উচিত। একদা ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন দুটি তখ্তির উপর লিখে তাঁদের পিতার নিকট গিয়ে বললেন আব্বাজান! বলুন কার লেখা সুন্দর! তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন যদি একজনের লেখা সুন্দর বলি অপরজন মনঃক্ষুণ্ন হবে যা আমার সহ্য হবে না। তাই তিনি বললেন, তোমাদের আম্মার কাছে যাও তিনি এর মীমাংসা করে দেবেন। তাঁরা হযরত

ফাতেমার নিকট আসলেন! তিনিও মীমাংসা না করে বললেন, তোমাদের নানার কাছে যাও। তাঁরা মহানবীর (সাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, নানাজান! কার লেখা সুন্দর? আপনি এর ফয়সালা করে দিন! মহানবী (সাঃ) বললেন, এর ফায়সালা করবে জিব্রাইল (আঃ)। হযরত জিব্রাইল (আঃ) বললেন, এটি আমার দ্বারা সম্ভব নয়। এর মীমাংসা করবেন খোদ্ আল্লাহ পাক।

মহান আল্লাহ্ জিব্রাইল (আঃ) কে বললেন, হে জিব্রাইল তুমি হাসান ও হোসাইনকে বল তাদের লেখা দুই জায়গায় রাখতে ও তুমি একটি আপেল বা ছিব ফল বেহেশ্‌ত হতে নিয়ে এসে উপর হতে ছেড়ে দাও। এ ফল যে লেখায় বসবে তার লেখাই সুন্দর বলে বিবেচিত হবে। তখন ফলটি জিব্রাইল (আঃ) উপর হতে ছেড়ে দিলেন। মহান আল্লাহর অপার মহিমায় ফলটি দু'ভাগ হয়ে দুটো লেখার উপরেই যেয়ে বসল। এতে উভয়ের লেখাই সুন্দর বলে বিবেচিত হলো। অতএব বুঝা যাচ্ছে স্বয়ং মহান আল্লাহ্ তাঁদের অসন্তুষ্টি পছন্দ করেন না।

"কানজুল গারায়েব" নামক গ্রন্থে আছে, এক গ্রাম্য লোক মহানবী (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে হরিণের একটি বাচ্চা দান করল। এই সময় হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) মহানবীর নিকট আসলে তিনি তাকে বাচ্চাটি দিয়ে দিলেন। ইমাম হাসানের হাতে বাচ্চাটি দেখে ইমাম হোসাইন জিজ্ঞেস করলেন ভাইজান বাচ্চাটি কোথায় পেয়েছেন? তিনি বললেন, নানাজান আমাকে দিয়েছেন। তখন ইমাম হোসাইন নানাজানের নিকট হরিণের বাচ্চা নেয়ার জন্য উপস্থিত হলেন। এমন কি বাচ্চার জন্য জিদ ধরলেন। হুজুরে পাক (সাঃ) তাঁকে অনেক বুঝালেন কিন্তু কোন কাজ হল না। তার চোখে পানি আসার উপক্রম হলো। হঠাৎ এক হরিণী সঙ্গে একটি বাচ্চা নিয়ে উপস্থিত হয়ে বলল, "হে রসূলাল্লাহ (সাঃ) আমার বাচ্চাটি গ্রাম্য লোক ধরে এনে আপনার খেদমতে দান করল। আর দ্বিতীয় বাচ্চাটি আমি মহান আল্লাহ্‌র হুকুমে হোসাইনের জন্য নিয়ে আস্‌লাম। যদি হোসাইনের চক্ষু হতে এক বিন্দু অশ্রু পড়ত তাহলে আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্ত কাঁপতে থাকত।"

"তারিখে কারবালা" গ্রন্থের ২৭০ পৃঃ, রওজাতুশ শুহাদা ২য় খণ্ড ২৬ পৃঃ বর্ণিত একদিন ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন কুস্তি খেলছিলেন। মহানবী (সাঃ) হযরত হাসান কে বললেন, হে হাসান হোসাইনকে জড়িয়ে ধর। তখন হযরত ফাতেমা (রাঃ) মহানবী (সাঃ) কে লক্ষ্য করে বল্‌লেন, হে আল্লাহ্‌র হাবিব আপনি ছোট ভাইকে জড়িয়ে ধরার জন্য বড় ভাইকে বললেন? মহানবী (সাঃ) বললেন, হযরত জিব্রাইল (আঃ) হোসাইনকে বলছেন-হে হোসাইন তুমি হাসানকে জড়িয়ে ধর।

মাওলানা আব্দুর রহমান জামী (রাঃ) "শাওয়াহেদুন নবুয়্যত" নামক পুস্তকে লিখেছেন ইমাম মোস্তাগফেরী দালায়েলুন নবুয়্যত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন নিতান্ত খোদাভীরু এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখলেন তিনি হাশরের ময়দানে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি

সহজেই পুলসেরাত পাড়ি দিয়ে চলে গেছেন। সেখানে দেখতে পেলেন মহানবী (সাঃ) "হাউজে কাওসারের" পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং হযরত হাসান ও হোসাইন (রাঃ) লোকজনকে কাওসারের পানি পরিবেশন করছেন। আমি কাওসারের পানি পান করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলাম কিন্তু তাঁরা উভয়েই আমাকে তা পরিবেশন করতে অস্বীকার করলেন। আমি তখন মহানবী (সাঃ)-র কাছে বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ, তাঁরা আমাকে কাওসারের পানি পরিবেশন করছেন না। দয়া করে বলে দিন যেন আমাকেও পানি পান করানো হয়। মহানবী (সাঃ) তখন বললেন তোমার এক প্রতিবেশী হযরত আলীর (রাঃ) সমালোচনা করে। তুমি তাকে বাধা দাওনি কেন?

আমি বললাম, লোকটা দুর্ধর্ষ। আমি দুর্বল। বাধা দিলে সে আমাকে খুন করে ফেলতো। মহানবী (সাঃ) তখন আমার হাতে একটা ছোরা দিয়ে বললেন- যাও এখনই এটা দ্বারা ওকে জবাই করে ফেল। আমি সেই ছোরাটা হাতে নিয়ে লোকটার বাড়ী গেলাম এবং তাকে জবাই করে চলে এলাম। এসে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমি ওকে জবাই করে এসেছি। তখন হুজুর (সাঃ) হযরত হাসান (রাঃ)কে নির্দেশ দিলেন যেন আমাকে কাওসারের পানি পান করানো হয়।

সকাল বেলা শুনতে পেলাম, আমার সেই প্রতিবেশী ঘুমের মধ্যেই খুন হয়ে গেছে এবং কাজীর লোকেরা তার কয়েক জন প্রতিবেশীকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। আমি তখন সোজা কাজীর নিকট হাজির হলাম এবং গোপনে তাঁকে আমার গত রাতের স্বপ্নের কথা সবিস্তারে বললাম। আমার বর্ণনা শুনে তিনি বিশ্বাস করলেন এবং গ্রেফতারকৃত সবাইকে মুক্ত করে দিলেন।

(স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ১১৫ পৃঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খাঁন, সম্পাদক, মাসিক মাদীনা দ্রষ্টব্য)

উক্ত পুস্তকের ৬০ পৃঃ লেখা আছে, সিরাতে ইবনুল জাওজি (রাঃ) (ইবনুল জাওজির পৌত্র) বর্ণনা করেছেন, আমার জানাশুনার মধ্যে একটি বৃদ্ধ লোক হঠাৎ একদিন অন্ধ হয়ে গেল। ইতিপূর্বে তার চোখে কোন রোগ ছিল বলে কেউ জানতো না। তার এই অন্ধত্বের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে, এ ব্যক্তি কারবালার যুদ্ধে শরীক ছিল। একদিন স্বপ্নযোগে দেখল যে, মহানবী (সাঃ) হাতের আস্তিন গুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তার হাতে একটি খোলা তলোয়ার, সামনে একটি চামড়া বিছানো এবং এর উপর হযরত হোসাইন (রাঃ) এর হত্যাকারীদের মধ্য থেকে দশ ব্যক্তির রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। মহানবী (সাঃ) একটি সুরমার শলাকায় হযরত হোসাইনের (রাঃ) রক্ত নিয়ে সেই বৃদ্ধ লোকটির চোখে লাগিয়ে দিলেন। সকাল বেলায় ঘুম ভাঙ্গার পর থেকেই সে অনুভব করল যে, তার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে।

উসওয়ায়ে হোসাইনীতে মাওলানা মুফতী মুঃ শফী (রহঃ) উল্লেখ করেন বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত আবু কায়িস নায়িম (রহঃ) ও ইমাম আছাকের (রহঃ) হযরত ইমাম

হাসান (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, এক লোক একদিন হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর পবিত্র মাজারের উপর প্রস্রাব করে। কিন্তু প্রস্রাব করার পরই লোকটি কুকুরের মতো চিৎকার করতে লাগল এবং চিৎকার করতে করতে অবশেষে তার ইহলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল। তাকে কবরস্থ করার পরও কবরের ভিতর হতে অনুরূপ আওয়াজ শোনা গেছে।

হযরত হোসাইনের শাহাদতের ঘটনায় যেসব পাষণ্ড অংশ নিয়েছিল তাদের পরিণামও অত্যন্ত ভয়াবহ হয়েছিল। তাদের কেউ শত্রুহস্তে নিহত হয়, কারও চেহারা বিবর্ণ ও বিকৃত হয়ে যায়। আর কেউ হয়ে পড়ে অন্ধ। কারবালার ঘটনায় ইয়াযিদের পক্ষাবলম্বনকারী এক বৃদ্ধ যখন এসব ঘটনা শুনতে পেল, তখন সে সদর্পে পরিহাস করে বলতে লাগল, কই আমিও তো এ ঘটনায় অংশ নিয়েছিলাম! কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার তো কিছু হলো না। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বৃদ্ধলোকটি কথা বলে ঘরে প্রদীপ জ্বালাতে উঠল। প্রদীপ জ্বালানো মাত্র প্রদীপের আগুন দেখে বৃদ্ধ সাংঘাতিক ঘাবড়ে গেল। সে আগুন আগুন বলে চিৎকার করতে লাগল। সে আগুন নিবানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেও রেহাই পেল না। মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী (রহঃ) নিজ পুস্তক 'শহীদে কারবালা'য় লিখেছেন-"ইমাম যুহরী (রঃ) বলেন যে সমস্ত লোক হযরত হোসাইনের হত্যায় অংশগ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে একজনও রেহাই পাওয়ার মত এমন ছিল না যে, সে আগেই দুনিয়াতে শাস্তিপ্রাপ্ত না হয়েছে। কাউকে হত্যা করা হয়, আবার কারো কারো চেহারা কুৎসিত হয়ে যায় অথবা বিকৃত হয়ে যায় বা কিছুদিনের মধ্যে তার রাজত্ব কেড়ে নেওয়া হয়। আর এটা স্পষ্ট যে, এগুলো এদের কৃতকর্মের আসল শাস্তি নয়, বরঞ্চ তার একটা নমুনা ছিল মাত্র যা মানুষকে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে দেখানো হয়েছিল।

উক্ত পুস্তকের ৭৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, হযরত হোসাইনের হত্যাকারীদের উপর এমনিতেই বিভিন্ন রকমের বিপদাপদ একের পর এক আপতিত হচ্ছিল। এছাড়া শাহাদতের ঘটনার মাত্র পাঁচ বৎসর পর হিজরী ৬৬ সালে মুখতার যখন ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের কেছাছ (বদলা) গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন সর্বসাধারণ তাকে সমর্থন প্রদান করে এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বিপুল শক্তি অর্জন করে কুফা ও ইরাকের উপর তার আধিপত্য বিস্তার করেন। দেশের ক্ষমতা লাভের পর তিনি সাধারণ ঘোষণা প্রদান করেন ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের ছাড়া বাকি সবাইকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হল। অপরদিকে হোসাইন (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের খুঁজে বের করতে পূর্ণশক্তি নিয়োগ করেন এবং এক একজনকে বন্দী করে হত্যা করেন। একদিনে ২৪৮ জনকে এ অপরাধে হত্যা করা হয় যে, তারা ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর হত্যায় শরীক ছিল। এরপর বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের অনুসন্ধান ও বন্দী করার কাজ শুরু হয়। আমর ইবনে হায্যাব যুবাইদি উষ্ণতা বোধ ও পিপাসা

নিয়েই পালিয়ে ছিল। পিপাসায় বেহুঁশ হয়ে সে পড়ে যায়, অতঃপর তাকে জবাই করে দেওয়া হয়। শিমার ইবনে যিল জওশন নামক যে ব্যক্তিটি হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর (শাহাদাতের) ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশী কঠোর ছিল তাকে হত্যা করে তার লাশ কুকুরের সামনে নিক্ষেপ করা হয়। আবদুল্লাহ্ ইবনে উসাইদ জুহানী, মালেক ইব্নে বশির বদি এবং হামল ইবনে মালিককে অবরোধ করা হয়। তারা ক্ষমা প্রদর্শনের আবেদন করে। উত্তরে মুখতার বলেন, জালিমের দল, তোমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দৌহিত্রের প্রতি দয়া প্রদর্শন করনি তোমাদের প্রতি কিভাবে দয়া প্রদর্শন করা যেতে পারে? অতঃপর সকলকেই হত্যা করা হয়। মালিক ইবনে বশির হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর টুপি খুলে নিয়েছিল, তার উভয় হাত ও পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে যুদ্ধের ময়দানে রেখে দেওয়া হয়। সে ছটফট করতে করতে মৃত্যুবরণ করে। উছমান ইবনে খালেদ এবং বশির ইবনে সমীত, মুছলিম ইবনে আকিলের হত্যায় সহযোগিতা করেছিল। তাই তাদেরকে হত্যা করে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। উমর ইবনে সাদ নামক যে ব্যক্তিটি হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর মুকাবিলায় সৈন্যদের পরিচালনা করেছিল, তাকে হত্যা করে তার মাথা মুখতারের সামনে উপস্থিত করা হয়। এদিকে মুখতার পূর্বেই তার ছেলে হাফেজকে তার দরবারে বসিয়ে রেখেছিলেন। যখন উমর ইবনে সা'দের মাথা দরবারে উপস্থিত করা হয়, তখন মুখতার হাফেজের উদ্দেশ্যে বললেন তুমি কি জান এটা কার মাথা, সে বলল হ্যাঁ, জানি। সে আরও বলল যে, এরপর আমারও বেঁচে থাকার সাধ নেই। তাকেও হত্যা করা হয়। এরপর মুখতার বললেন উমর ইবনে সা'দকে হত্যা করা হল হোসাইন (রাঃ) এর বদলায়। আর হাফেজকে হত্যা করা হল আলী ইবনে হোসাইনের (রাঃ) বিনিময়ে। উক্ত গ্রন্থে ৬২ পৃষ্ঠায় ইয়াজিদ সম্পর্কে উল্লেখ আছে ইমাম হোসাইনের মাথা মোবারক যখন ইয়াজিদের সামনে রাখা হয় তখন তার হাতে একটি ছড়ি ছিল। সে হযরত হোসাইনের (রাঃ) দাঁতের উপর ছড়ি রেখে ইবনে হুমামের শে'রগুলো আবৃত্তি করে। সেখানে আবু হাযরাহ আছলামী (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন "হে ইয়াজিদ তুমি তোমার ছড়ি হোসাইনের (রাঃ) দাঁতে লাগাচ্ছ অথচ আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে দেখেছি যে তিনি এগুলোতে চুমু দিচ্ছিলেন"

উক্ত পুস্তকের ৬৫ পৃঃ আরও উল্লেখ আছে কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, প্রথম দিকে ইয়াজিদ ইমাম হোসাইনকে হত্যা করায় খুশি হয়েছিল এবং হযরত হোসাইনের পবিত্র মাথা যখন ইয়াযীদের সামনে আনা হয় তখন সে আনন্দ প্রকাশ করে।

উক্ত পুস্তকের ৫৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে, নির্দয় অভিশপ্ত ইবনে জিয়াদের নির্দেশ ছিল যে (ইমাম হোসাইন ও তার সাথীদের) হত্যাকাণ্ড সমাধার পর মৃতদেহগুলো যেন ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট করা হয়। উমর ইব্নে সা'দ আদেশ কার্যকর

করার জন্য কয়েকজন অশ্বারোহীকে নির্দেশ দেয়। তারা এ নির্দেশ বাস্তবায়িত করে।

উক্ত গ্রন্থের ৬৪ পৃঃ লিখিত আছে, হযরত হোসাইনের কন্যা সখিনা বলতে শুরু করেন যে, "আমি ইয়াযীদকে কোন কাফির অপেক্ষা উত্তম দেখিনি"।

মাসিক তরজুমান পত্রিকায় সফর ১৪১৪ হিঃ ৩৩৩ পৃঃ বর্ণিত আছে একদিন মহানবী (সাঃ) হযরত আবুজর গিফারী (রাঃ)কে হযরত আলী (রাঃ)-এর ঘরে গিয়ে তাঁকে ডেকে আনার জন্য পাঠালেন। তিনি হযরত আলীর (রাঃ) ঘরে গিয়ে দেখেন ঘরে কেউ নেই। কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন ঘরে চাক্কি (গম পেষার যন্ত্র) স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলছে। কোন লোকের সাহায্য ব্যতীতই গম পিষ্ট হয়ে আটা তৈরী হয়ে যাচ্ছে। এমন অভাবনীয় ঘটনা দেখে তিনি ভাবতে ভাবতে মহানবীর (সাঃ) কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন মহানবী (সাঃ) তাকে বললেন, "আবুজর জেনে রেখো এ ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ্‌র এমন কিছু ফেরেশ্‌তা নিয়োজিত আছেন। যারা আমার বংশধরদের সাহায্য করে থাকে।"

বস্তুতঃ নবী বংশীয়দের খেদমতে নিয়োজিত ফেরেশ্‌তাগণই সেদিন হযরত আলী (রাঃ) এর ঘরে চাক্কি চালাচ্ছিলেন বলে হযরত আবুযার (রাঃ) স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাক্কি চলতে দেখেছিলেন।

মক্কার কাফেররা প্রায়ই মহানবীকে উত্যক্ত করত, তাঁর উপর অত্যাচার চালাত। সেই সময়ে স্নেহময়ী মায়ের মত বালিকা ফাতেমা (রাঃ) পিতার পাশে এসে দাঁড়াতেন। পিতার ক্ষতস্থানের পরিচর্যা করতেন। পিতাকে কাফেরদের কাছ থেকে আগলে রাখার চেষ্টা করতেন। কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হতেন। এ জন্যে হযরত ফাতেমাকে সকলে ডাকতো 'উম্মে আবিহা' বলে। উম্মে আবিহার অর্থ তার 'পিতার মা'। হযরত ফাতেমা মহানবী (সাঃ)-এর কন্যা হয়েও স্নেহময়ী মায়ের মত মহানবী (সাঃ) কে ভালো বাসতেন বলেই তাঁর উপাধি হয়েছিল উম্মে আবিহা। ইসলাম প্রচারের কঠিন মিশন নিয়ে মহানবী (সাঃ) দেশান্তরিত হয়েছিলেন। তিনি নিজ জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিযরত করেছিলেন। সেই সময়ও হযরত ফাতেমা পিতার পদাংক অনুসরণ করে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। মদিনায় পৌঁছে মহানবী (সাঃ) তাঁর আদরের উম্মে আবিহাকে তাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হযরত আলীর সঙ্গে বিয়ে দেন। হযরত আলী ছিলেন মহানবীর হাতে গড়া জ্ঞানে-গরিমায় শ্রেষ্ঠ একজন আদর্শ মুসলমান। হযরত ফাতেমা (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) এর মিলনের ফলে ইসলামের গৌরব পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর পবিত্র গৃহে জন্মগ্রহণ করেন হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) ও হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)। এ পরিবারের বদৌলতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র বংশধারা পৃথিবীর বুকে স্থায়িত্ব লাভ করে।

ইসলামে আহলে বাইতের মর্যাদা অপরিসীম। প্রিয়তম কন্যা হযরত ফাতেমা

(রাঃ)কে মহানবী (সাঃ) সীমাহীন স্নেহ করতেন, ঠিক তেমনি শ্রদ্ধাও করতেন। পিতা হয়ে মেয়েকে শ্রদ্ধা করা মানব ইতিহাসে খুবই বিরল ঘটনা। হযরত ফাতেমার অসাধারণ গুণাবলী এবং মর্যাদার কারণেই মহানবী তাঁকে যথোপযুক্ত সম্মানদানে কুণ্ঠিত হতেন না। মহানবী (সাঃ) যখনই ফাতেমার ঘরের সামনে দিয়ে যেতেন তখনই তাঁকে সালাম জানাতেন এবং তাঁর কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন। এমনও দেখা গেছে হযরত ফাতেমা আসলে মহানবী (সাঃ) দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান দেখাতেন। মাওলানা মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম সাহেব "বিশ্বনবীর জীবন কথা" পুস্তকের ১৫১ পৃঃ লিখেছেন "হযরত রাসূলে পাক (সাঃ) তাঁর কন্যাদের মধ্যে হযরত ফাতেমাকেই অধিক স্নেহ করতেন। তিনি কোথাও গমন করার সময় সর্বশেষে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতেন-তাঁকে না বলে তিনি কোথাও যেতেন না। আবার সফর হতে ফিরে প্রথমেই তিনি কন্যা ফাতেমার সাথে সাক্ষাত করতেন।" এরূপ বর্ণনা মাদারেজুন্নবুয়্যতেও রয়েছে। হযরত ফাতেমা তাঁর মহান পিতা হযরত মুহম্মদ (সাঃ)কে এত অধিক ভালোবাসতেন যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। নবীজীর ইন্তেকালের পর হযরত ফাতেমা নবীজীর বিচ্ছেদে কিরূপ অধীর চিত্ত হয়েছিলেন, সেদিকে লক্ষ্য করলেই অনুমান করা যায় নবীজীর প্রতি তার ভালোবাসা কিরূপ ছিল। ওফাতুন্নবী বা বিশ্বনবীর তিরোধান পুস্তকে ৬০-৬১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (রাঃ) পিতৃশোকে এমন করুণভাবে ক্রন্দন করেছিলেন যে, তাঁর ক্রন্দনে মদিনার আকাশে কালোছায়া দেখা দিয়েছিল। মদীনায় একটি লোকও এমন ছিল না যে, হযরত ফাতেমার শোকাবহ অবস্থা ও করুণক্লিষ্ট বিষাদ মলিন মুখ দর্শন করে চোখের পানি সংবরণ করতে পেরেছেন।

মহান পিতার ইন্তেকালের পর শোকাবেগ সহ্য করতে না পেরে তিনি জান্নাতুল বাকীতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এর নাম রেখেছিলেন বাইতুল আহ্‌যান বা শোকের ঘর। এই ঘরে বসে তিনি একাকী রোদন করতেন ও লোক সমাজের কোলাহল-কলরব হতে দূরে থেকে নির্জনে মহান পিতার কার্যাবলী স্মরণ করে অশ্রুজলে বুক ভাসাতেন।

মোঃ নজরুল ইসলাম সাহেব লিখিত "নূরদর্শন" পুস্তকের ৪১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যখন শিশু আসগর (রাঃ)কে হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) মহাপবিত্র কোল মোবারকে তুলে শত্রু শিবিরের কাছে গিয়ে শিশুকে একটু পানি দেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন, পানির বিনিময়ে শত্রুরা আসগর (রাঃ) কে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করল। সাথে সাথেই আজগর (রাঃ) ভূ-পৃষ্ঠে পড়ে গেলেন এবং নিমিষের মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করলেন। তৎক্ষণাৎ হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর হাতে তিনফোঁটা পবিত্র রক্ত ত্রিভুজ আকারে জমা হয়ে গেল। তখন তিনি আকাশ, বাতাস ও জমিনকে এই মহাপবিত্র রক্ত গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানালে সকলেই উত্তর দিল যে, যদি তারা

এই মহাপবিত্র রক্ত গ্রহণ করে তবে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে চন্দ্র-সূর্যের আলো আসবে না। অনাদিকাল পর্যন্ত পৃথিবীতে শস্য উৎপাদন হবে না, কারণ এই পবিত্র রক্ত গ্রহণ করার মত শক্তি পৃথিবীর কোন কিছুরই নেই। অতঃপর হযরত হোসাইন (রাঃ) উক্ত রক্ত মোবারক নিজের মুখমণ্ডলে মুছে আল্লাহ্তায়ালার শুকর গুজার করলেন। আর মুখে উচ্চারণ করলেন, হে আল্লাহ তোমার জন্যই ধৈর্য ধরলাম। এর পরক্ষণেই বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ হল, একে একে হযরত হোসাইন (রাঃ)এর পরিবারবর্গের প্রায় সবাই ইহলোক ত্যাগ করলেন। হযরত হোসাইন (রাঃ) সমরক্ষেত্রে অবতরণের সাথে সাথে দেখতে পেলেন যে, জিব্রাইল (আঃ) আলমে আরওয়ায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে বলেছেন, হে আল্লাহ কেমন করে তুমি এই নিষ্ঠুরকাণ্ড অবলোকন করছো? আজ তোমার প্রিয় হাবিব হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর স্নেহের ধন খাতুনে জান্নাত ও শেরে খোদার পরম স্নেহাশীষ সন্তান তথা তোমার মহা পবিত্রের ধন কিভাবে পশু ইয়াজিদের সৈন্যের হাতে ইহলোক ত্যাগ করছে। আমি তা সহ্য করতে পারছি না। আমাকে এই মুহূর্তে আদেশ কর আমার দুই ডানা দিয়ে ইয়াজিদের সমস্ত কিছু ধ্বংস করে দিয়ে আসি। আল্লাহ্র আদেশ যখন প্রায় সমাসীন তখনই ইমাম হোসাইন (রাঃ) জিব্রাইল (আঃ)কে বারণ করে বললেন, হে জিব্রাইল আপনি সরে যান। এটি আমার মহাপরীক্ষার সময় এবং আমার নানার উম্মতকে সংশোধনের এটিই উৎকৃষ্ট সময়। এর আরও গভীর তাৎপর্য হল কাল কিয়ামতে শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ), খাতুনে জান্নাত ও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এই শাহাদাতের উজরত বা বিনিময় চাইবেন, সুতরাং এই মহাপবিত্র শাহাদাত শুধু সাধারণ শাহাদতই নয় বরং সমস্ত উম্মতের নাজাতের সম্পদ। আর সে জন্যই হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "তাহাদের শাহাদাত আমার শাহাদাত।" তিনি আরও বলেছেন, "যে আহলে বাইতকে ভালোবাসবে না সে আমার উম্মত নয়।" সুতরাং কারবালা শুধু একটি ইতিহাসই নয় বরং এর তাৎপর্য বুঝতে না পারলে মহানবী (সাঃ)র উম্মতভুক্ত হওয়া সুদূর পরাহত।

AwliyaLink, www.ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com,
E-mail: awliya1214@gmail.com
★★★★★★★★★★★★★★★

আহ্লে বাইতের প্রেমের কতিপয় নির্দেশনা

■ আহ্লে বাইতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন ও তাঁদের যথাযথ অনুসরণ।

■ যে সব কথা কাজ ও সমর্থন দ্বারা আহ্লে বাইতের মহান শানের হানি হয় এসব হতে সম্পূর্ণ দূরে থাকা।

■ যে সব লোক আহলে বাইতকে প্রাণাধিক ভালোবাসে না এবং তাঁদের ভালবাসার পরিচয় দিতে কৌশলগতভাবে অস্বীকার করে ও আহ্লে বাইতকে বেশী বেশী প্রশংসা করতে দেখে তাদের মুখ ম্লান হয়ে যায়, এসব লোকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

■ যে সব স্থানে অনুরাগের সাথে পবিত্রতার সাথে তাদের আলোচনা বা বয়ান করা হয় সে স্থানটিকে উত্তম মনে করা।

■ তাঁদের পরিবারবর্গ ও বংশধরগণের প্রতি এবং তাঁদের ভক্তগণের প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রদর্শন করা ও তাজিম করা।

■ যে কোন ভাষা, যে কোন পদ্ধতিতে, ভাবের আবেগে পবিত্র মনে যারা আহ্লে বাইতের প্রশংসা বা জীবন চরিত বর্ণনা করে তাঁদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ না রাখা।

■ তাঁদের গুণকীর্তন করতে ও শুনতে আনন্দ পাওয়া। কারও বাধা, আপত্তি ও যুক্তি এ কাজ হতে বারণ করতে না পারা।

■ কুখ্যাত ইয়াযীদ এবং ইয়াযিদীগণকে মন্দ বলতে অস্বীকার করে, বরং সুযোগ পেলেই ইয়াযীদ এবং ইয়াযিদীদের প্রশংসা করে এমন সব লোকের সংশ্রব ত্যাগ করা।